ইউনিট ৩

রিসালাত ও নবুওয়াত

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ) -এর উপর সর্বপ্রথম এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। তাই তাঁকে রিসালাত ও নবুওয়াত প্রদান করা হয়। হযরত আদম (আ) থেকে রিসালত ও নবুওয়াতের ধারা শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রিসালতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর সহজ সরল পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সমাজে চিরন্তন ও কল্যাণকর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাঁর পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বিধানের অপেক্ষায় থাকেন। কেননা মানব প্রসূত স্বল্প জ্ঞান বিশ্বমানবতার চিরকল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই আল্লাহ বিশ্ব মানবের মুক্তির দূত ও বার্তবাহক হিসেবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বিধানাবলি মানব জাতির নিকট পৌছে দেওয়ার মাধ্যমকে রিসালাত ও নবুওয়াত বলা হয়। আর এ দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য যাঁকে মনোনীত করা হয় তিনি হচ্ছেন রাসূল বা নবী। রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেউ রিসালাতকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসুলের আগমন ঘটবে না। যদি কোন ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের পর নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে, তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী বা কাযযাব।

বর্তমানে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী স্বীকার করায় তারা কাফির হিসেবে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ঘৃণিত হয়েছে।

মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আনীত বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। আর তা হলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১: রিসালাত ও নবুওয়াত -এর পরিচয়
❖ পাঠ-২: নবী ও রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
❖ পাঠ-৩: নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য
❖ পাঠ-৪: নবী ও রাসূলগণের নিস্পাপ হওয়া
❖ পাঠ-৫: প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ)
❖ পাঠ-৬: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ
❖ পাঠ-৭: হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী
❖ পাঠ-৮: হযরত মুহাম্মদ (স) খাতামুল আম্বিয়া

পাঠ-১

রিসালাত ও নবুওয়াত-এর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবুওয়াত, রিসালাত এবং ওহীর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ওহী অবতীর্ণের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের নাম বলতে পারবেন;
- নবী-রাসূলগণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

মানবজাতিকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে কিভাবে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য করে তোলা যায় সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেই শিক্ষক হয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। এ বার্তা যাদের উপর নাযিল হয়েছে তাঁরাই হলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করার ইচ্ছ পোষণ করে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। হযরত আদম (আ) পৃথিবীর প্রথম মানুষ। আদম (আ) থেকেই মানবজাতির ক্রমধারা আরম্ভ হয়েছে। আর এ মানবজাতিকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে কিভাবে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য করে তোলা যায় সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেই শিক্ষক হয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। এ বার্তা যাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরাই হলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূল। নবী-রাসূলগণই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিধি নিষেধ লাভ করে তা মানবাতির মধ্যে প্রচার করেছেন। এ ধারা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত শেষ হয়। মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একলাখ বা দুইলাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলণ ঐশীবাণী শিক্ষালাভ করে মানব জাতির হিদায়াতের পক্ষে কাজ করেন। নবী-রাসূলগণ সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। তারা গুনাহ থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিস্পাপ করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। আল্লাহ তা'আলা যাকে নির্দিষ্ট আদেশ পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন রাসূল। রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাত বা কিতাব অর্থাৎ বিধি-বিধান প্রাপ্ত হন। রাসূলগণ সমগ্র মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً

"তোমাকে মানুষের জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আন-নিসা-৭৯)।

সুতরাং নবুওয়াত ও রিসালাত হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তির মধ্য সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যম, যা ওহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা প্রচার করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ বা বাণী মানুষের কাছে পৌঁছার মাধ্যম হলেন ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ)। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী বিভিন্নভাবে রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলগণের কাছে প্রত্যাদেশ পৌঁছে তা হল ওহী।

এখানে ওহীর বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হল। ওহী কয়েকভাবে নবী-রাসূলগণের কাছে প্রেরিত হয়েছে। যেমন-

১. **সত্য স্বপ্ন :** আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ওহীর সকল দিক থেকেই পূর্ণত্ব দান করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে প্রথম দিকে যে ওহী অবতীর্ণ হয় তা ছিল সত্য স্বপ্ন। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে কোন কিছু জানিয়ে দিতেন। তাই তিনি যা কিছু স্বপ্নে দেখতেন তা দিবালোকের মতই সত্য হয়ে দেখা দিত। ওহীর এ পদ্ধতিটি বেশিরভাগ গোড়ার দিকে অর্থাৎ নবুওয়াতের পথ দিকেই সংঘটিত হয়েছিল।

২. **ফেরেশতা কর্তৃক অন্তরে ফুঁকে দেওয়া :** আল্লাহর বাণী বহনকারী ফেরেশতা মহানবী (স)-এর অন্তরে ওহী ঢেলে দেন। অথচ তিনি ফেরেশতাকে দেখতে পাননি। যেমন- একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত (স) বলেছেন: হযরত জিবরাঈল (আ) আমার মনে এ কথা জাগ্রত করে দিয়েছেন যে, কোন প্রাণীই মারা যাবে না যতক্ষণ না তার আহার্য শেষ হয়ে যায়। তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং সৎভাবে আহার্য সংগ্রহ কর। রুযী লাভে বিলম্ব দেখলে আল্লাহর নাফরমানীর আশ্রয় নিয়ে তা পেতে যেয়ো না। কারণ আল্লাহর কাছে যে নিয়ামত আছে তা তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

৩. **ঘন্টার আওয়াজের মত :** কখনো কখনো ঘন্টার আওয়াজের মতো ওহী আসতো। আর এ পদ্ধতিটি মহানবী (স)-এর জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। এমনকি শীতের দিনেও মহানবী (স) ঘেমে যেতেন। তিনি যদি কিছুতে সওয়ার থাকতেন তা হলে সওয়ারী ওহীর ভারে মাটির সাথে লেগে যেত।

৪. **মানুষের আকৃতিতে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন :** কখনো কখনো জিবরাঈল (আ) মানুষের রূপ ধরে মহানবী (স)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। হযরতকে সামনে রেখেই তিনি ওহী জ্ঞাত করে যেতেন। এরূপ অবস্থায় কখনো বা সাহাবায়ে কিরাম সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

৫. **ফেরেশতার নিজস্বরূপে আগমন :** কখনো কখনো ওহী বাহক ফেরেশতা তাঁর নিজস্ব অবয়বে আসতেন এবং মহানবী (স)-এর নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন। এভাবে দু'বার ওহী এসেছিল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা সূরা নাজমে এ পদ্ধতিটি উল্লেখ করেছেন।

৬. **আল্লাহ স্বয়ং নবীকে সরাসরি জানিয়ে দিতেন :** এ পদ্ধতিতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নবী (স)-এর কাছে ওহী পৌঁছে দিতেন। এ ধরনের ওহী মিরাজের রাতে নাযিল হয়েছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) যখন মিরাজের রাতে আকাশ পরিভ্রমণে গেলেন এবং তাঁর ওপর নামায ফরয করা হল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরতের সাথে কথা বলেছিলেন।

৭. **পর্দার আড়াল থেকে সম্বোধন করে ওহী পৌছান :** এ ধরনের ওহী হযরত মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের আড়াল থেকে হযরত মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী (স)-কেও এভাবে পর্দার আড়াল থেকে ঐশী বাণী শুনিয়ে দেওয়া হত, যার প্রমাণ হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়।

সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মাত্র পঁচিশজন নবী-রাসূলের নাম বর্ণনা করেছেন।

নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান

সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মাত্র পঁচিশজন নবী-রাসূলের নাম বর্ণনা করেছেন। সকল মুমিমনের জন্য তাঁদের প্রত্যেকের নবুওয়াতের উপর ঈমান আনা ফরয। তাঁদের উপর এ ধরনের বিশ্বাস রাখা যে, তাঁরা নবী ও রাসূল ছিলেন। তাঁরা মানুষের হিদায়েতের নিমিত্তে আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত হয়েছেন। কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, আল-কুরআনে যে সকল নবী ও রাসুলের নাম বর্ণিত হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করা অথবা কাউকেও নবী হিসেবে সন্দেহ করা। আল-কুরআনে যে সকল নবী ও রাসূলের নাম বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন:

হযরত আদম (আ), হযরত ইদ্রীস (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত লুত (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত শুআয়ব (আ), হযরত আইয়ুব (আ), হযরত যুলকিফল (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত হারুন (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত ইলিয়াস (আ), হযরত ইউশা (আ), হযরত ইউনুস (আ), হযরত যাকারিয়া (আ), হযরত ইয়াহইয়া (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত মুহাম্মদ (স)।

আরো অনেক নবী রয়েছেন যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ নেই এবং পবিত্র কুরআনে তাঁদের কোন ঘটনাও উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁদের উপর সামষ্টিকভাবে ঈমান আনয়ন করা ফরয। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তা'আলা স্থান ও কালের চাহিদা মোতাবেক প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে :

وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

"অনেক রাসূল, যাদের কথা আমি তোমাকে বলিনি।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৪)

নবুওয়াতের দিক দিয়ে নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

একথা প্রত্যেক মুসলমানকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, নবুওয়াতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নবী এবং রাসূলই সমান। তাঁদের মধ্যে কোন পারস্পরিক পার্থক্য নেই। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বৈধও নয়।

আর এটা আল-কুরআনের এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

"রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)

হাদীস থেকেও এ কথার সত্যতা প্রমাণ করা যায়। যেমন- রাসূল (সা) বলেন :

لا تخير ونى على موسى ولا تفضلونى على الأنبياء .

"তোমরা আমাকে মূসা (আ) -এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না আর তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীদের উপর প্রাধান্য দিও না।"

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা নবুওয়াত সম্পর্কে সমতার কথা বলা হয়েছে। নবীগণের মর্যাদাগত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়নি।

মর্যাদার দিক থেকে নবী-রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, আমাদের প্রিয় নবী (স) তিনি এককভাবে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেননা গোটা মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হওয়াটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে নবী (স) বলেন:

انا أكرم الأولين والاخرين عند الله ولا فخر

"আমি প্রথম ও শেষ মানবগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত। এতে গর্বের কিছু নেই।"

সত্যবাদী ও আমানতদার হওয়া নবী-রাসূল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে হেফাজত করেন।

নবী রাসূলগণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

নবী-রাসূলগণের মধ্যে যে সকল শর্ত বা গুণ থাকা অবশ্যম্ভাবী তা নিম্নে বর্ণনা করা হল-

প্রথমত : নবী রাসূলগণ পুরুষ হবেন : নবুওয়াত এবং রিসালাত নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কথার স্বপক্ষে যুক্তি ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন সকলেই পুরুষ ছিলেন। কোন মহিলাকে নবী-রাসূল করে পাঠাননি। নবী-রাসূল হওয়ার জন্য যে পরিপূর্ণ গুণাবলী থাকা অনিবার্য তা হল নবী-রাসূল নারী হওয়া থেকে মুক্ত থাকবেন। সকল মুসলমানই এ বিষয়ে একমত এবং এ বিষয় সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা দেয়নি। হযরত মূসা (আ)-এর মাতা এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মায়ের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়া তাদের নবী-রাসূল হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কারণ সে ওহী শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ জানিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয়ত : নবী রাসূলগণ সত্যবাদী ও আমানতদার হবেন

সত্যবাদী ও আমানতদার হওয়া নবী-রাসূল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে হেফাজত করেন। যদি তাঁরা এরূপ না হতেন তবে তাদেরকে মানুষের প্রতি প্রেরণ করা নিরর্থক হত। নবী-রাসূলগণকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত রাখা আল্লাহ

তা'আলার জন্য কঠিন কাজ নয়। নবী-রাসূলগণ মিথ্যা বলা থেকে পবিত্র। তাঁরা শরীআতের বিষয়বস্তু ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশকৃত বিধি-নিষেধ আমানতদার হিসেবে রক্ষা করেন। তাঁতে কোন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করা থেকে তাঁরা সবসময় পবিত্র ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী ও আমানতদার। ভুলক্রমে যদি কোন ছগীরা গুনাহ হয়ে যেত সাথে সাথে তাঁরা অনুশোচনা করতেন এবং আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিতেন।

তৃতীয়ত : নবী-রাসূলগণ পাপমুক্ত হবেন

গুণাহর মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে অবশ্যই পবিত্র থাকবেন। নবী-রাসূল হওয়ার জন্য এ শর্ত পূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। নবী-রাসূলগণ কুফরী করা থেকে পবিত্র। নবুওয়াতের পূর্বে ও পরে তাঁদের দ্বারা কবীরা গুণাহ সংঘটিত হতে পারে না। তাঁদের দ্বারা সগীরা গুনাহ সংঘটিত হবে কিনা তা নিয়ে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে'র মতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁরা ছোট গুনাহও করতে পারবেন না।

চতুর্থত : পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া

নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ শর্তটি থাকা অত্যাবশ্যক। তাঁদের জ্ঞান অপূর্ণ হওয়া অথবা ধারণ করার মধ্য দুর্বলতা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ সকল অসম্পূর্ণ গুণ নবী-রাসূল হওয়াকে রহিত করে। নবুওয়াত লাভ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। মানুষ চেষ্টা করে নবুওয়াত লাভ করতে পারে না। এটি আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকে ইচ্ছা নবী-রাসূল-এর মর্যাদা দান করেন।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. পৃথিবীর প্রথম মানুষ হলেন-
   ক) হযরত মুহাম্মদ (স);
   খ) হযরত আদম (আ);
   গ) হযরত খিযির (আ);
   ঘ) হযরত লুকমান (আ)।

২. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে-
   ক) ইবাদত করা;
   খ) মানবজাতিকে হিদায়াত করা;
   গ) আল-কুরআনের প্রচার করা;
   ঘ) কাবা ঘর মেরামত করা।

৩. ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি কয়টি?
   ক) ৬টি;
   খ) ৯টি;
   গ) ৭টি;
   ঘ) ৪টি।

৪. আল-কুরআনে কতজন নবী-রাসূলের কথা বর্ণিত আছে?
   ক) ৩২ জন;
   খ) ২৮ জন;
   গ) ৩০ জন;
   ঘ) ২৫ জন।

৫. নবী-রাসূলগণের জন্য সত্যবাদী হওয়া-
   ক) সুন্নাত;
   খ) মুস্তাহাব;
   গ) উত্তম;
   ঘ) শর্ত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নবুওয়াত ও রিসালাত এর পরিচয় দিন।
২. নুযুলে ওহীর পদ্ধতিগুলো লিখুন।
৩. নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা কী জরুরি? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।
৪. নবী-রাসূলগণের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নবুওয়াত ও রিসালাত বলতে কী বুঝেন? নবী-রাসূলগণে বিশ্বাস করা কী অপরিহার্য? প্রমাণ দিন।
২. নবী-রাসূলগণের গুণাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২

নবী ও রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবী ও রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- 'মানব জীবনে নবী ও রাসূল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন' একথাটি প্রমাণ করতে পারবেন;
- 'নবী ও রাসূলগণ মানুষের অনুসরণীয় আদর্শ ও নেতা' এই কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

নবুওয়াত ও রিসালাত মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত। পবিত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নে এবং বুদ্ধিবৃত্তির নিরিখে পর্যালোচনা করলে নবী-রাসূল প্রেরণের কতিপয় উদ্দেশ্য ও কারণ পরিলক্ষিত হয়। এখানে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল-

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন

দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য মানুষের যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয় আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে সবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিসে মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল হয়, সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিক নির্দেশনা দানকারীর ব্যবস্থাও করেছেন। মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করে নিশ্চিত ও চিরন্তন সাফল্য লাভ করতে পারে, মানুষের সকল প্রয়োজনের চেয়ে এটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রয়োজন। আর আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে সবচেয়ে বড় এ প্রয়োজনটি পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী-

মানুষ কীভাবে জীবন- যাপন করে নিশ্চিত সাফল্য লাভ করতে পারে, যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ সবচেয়ে বড় এ প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ

"আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। তাদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম, সৎকাজ করতে, সালাত আদায় করতে এবং যাকাত দিতে; তারা আমারই ইবাদত করতো।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৭৩)

আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের প্রতি আহবান

নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন দুনিয়ার মানুষকে তাদের ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। মানব জাতিকে এক ও একক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তার ঐকান্তিক দাসত্ব কবুলের জন্য এবং একমাত্র তাঁর ইবাদত করার দিকে আহবান জানানোর নিমিত্তেই আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। এ পর্যায়ে আল-কুরআনের ঘোষণা-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" (সূরা আল আম্বিয়া : ২৫)

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক-বাহক হিসেবে

আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান জনগণের নিকট পৌছে দেওয়া নবী-রাসূলদের প্রধান কর্তব্য। আর এ বিরাট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর বিধান

আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান জনগণের নিকট পৌছে দেওয়া নবী-রাসূলদের প্রধান কর্তব্য।

পৌছে দেওয়ার জন্য যে মাধ্যম ও বাহন প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। আল্লাহ নিজেই এই বাহন ও মাধ্যমরূপে নবী-রাসূলদের প্রেরণের নিয়ম চালু করেছেন। নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুওয়াত জীবনব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সে দায়িত্ব পালনের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেননি। তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব কখনই উপেক্ষা করেননি।

আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রাসূল! তোমার রব এর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা প্রচার করো। যদি তা না কর, তবে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬৭)

অনুসরণীয় আদর্শ নেতা রূপে

আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ বিশ্বমানবের অনুসরণীয় নেতা, আদর্শ ও পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তাঁদেরকে যেমন উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, তেমনি তাঁরা হলেন বিবেক বুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ এবং আচার আচরণে পবিত্রতম। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُول ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল-আহযাব : ২১)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-মুমতাহানা-৪)।

আল্লাহ তা'আলা এই আদর্শ হিসেবেই তাদের অনুসরণ করে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ

"তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ করো।" (সূরা আল-আনআম : ৯০)।

সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধানদাতা হিসেবে

পথভোলা মানব জাতিকে সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথের দিকে নিয়ে আসা এবং সে পথে লক্ষ্যস্থলে পরিপূর্ণভাবে পৌছ দেওয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

পথভোলা মানব জাতিকে সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথের বা সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে নিয়ে আসা, সে পথে চলতে সাহায্য করা এবং সে পথের লক্ষ্যস্থলে পরিপূর্ণভাবে পৌছ দেওয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করান ও তাঁর বিধান জানিয়ে দেন। সেগুলো বাস্তবভাবে পালনের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার পথের সন্ধান দেন, পথের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি সন্ধিক্ষণে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে নির্ভুল পথের দিকে চালিত করেন। এ কাজ নির্ভুলভাবে করতে পারার জন্যই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের উপর কিতাব নাযিল করেন। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-

الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

"আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, এটি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি

পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।" (সূরা ইবরাহীম : ১)

এ আয়াতটিতে আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়ার এবং রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, মানুষকে কুফর ও শিরকের পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা এবং মানুষকে আল্লাহর পথের সন্ধান দেওয়া, আল্লাহর পথে চালিত করে শেষ মনযিল তথা আল্লাহকে পাওয়া পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে চলা। আল্লাহ বলেন,

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ - يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমরা কিতাবের যা কিছু গোপন করতে সে তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা আল-মায়িদা : ১৫-১৬)

মানব ও মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করা

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধানের আলোকে মানব ও মানবাত্মাকে এবং সমাজ সভ্যতাকে শিক্ষা- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন কল্পে মানবের মধ্যে উত্তম ও সৎগুণাবলীর বিকাশ সাধন এবং নির্মল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার্থে নবী ও রাসূলগণ এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে বলেন:

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের আলোকে মানব ও মানবাত্মাকে এবং সমাজ সভ্যতাকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার্থে নবী-রাসূলগণ এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন।

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

"আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

মানবকে নৈতিকতাবাদী হিসেবে তৈরি করা

নবীগণ মানুষকে ধ্বংসশীল বৈষয়িক জীবন থেকে পরকালীন স্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত করেন। বস্তুবাদের পরিবর্তে তাকে নৈতিকতাবাদী বানানোর মিশন ও কর্তব্য নিয়েই নবী-রাসূলদের আগমন। আল-কুরআনের নির্দেশ-

وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

"এ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জনতো!" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৪)

পরকালীন জীবন সম্পর্কে অবহিত করা

মানুষকে পরকালের কথা জানিয়ে দেওয়া। পরকালে পুনরুত্থানের কথা বলে তাদের উপদেশ প্রদান। মৃত্যুর পর মানুষকে যে অনিবার্যরূপে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে সে বিষয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করা। আর কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মানব ও জিন জাতি যে কঠিন অবস্থা এবং জবাবদিহির মুখোমুখি হবে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

আল-কুরআনে সে মর্মে বর্ণিত হয়েছে-

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ

يَوْمِكُمْ هَٰذَا

"তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বর্ণনা করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করতো?" (সূরা আল-আন'আম : ১৩০)

সাক্ষী হিসেবে

কিয়ামতের দিন যখন মানুষের সম্মুখে তাদের আমলের হিসাবের ফর্দ তুলে ধরা হবে, তখন তারা আতংকে এবং পরবর্তী পরিণামের চিন্তায় অসৎ আমল ও পাপাচারকে অস্বীকার করে বলবে, আমরা তো এসব কাজ করিনি। এগুলো আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মাত্র। এহেন মিথ্যা দাবি যেন তারা সেদিন উত্থাপন করতে না পারে, তাদের আমলের সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আল-কুআনের বাণী-

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

"নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট রাসূলকে সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যেমনি ফিরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল : ১৫)

অভিযোগ-অজুহাত দূরীকরণ

নবী ও রাসূলগণ মানুষের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে তাদের হিদায়েত করার দায়িত্ব নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন যাতে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মানুষ এ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন না করতে পারে যে, হে আল্লাহ তোমার বিষয়ে, তোমার আইন-কানুন, আহকাম, শরীয়াতের কোন বিষয়েই তো আমরা জানতে পারিনি। আমরা এসব বিষয়ে জানলে অবশ্যই তোমার অনুগত্য করতাম। আল কুরআনের ঘোষণাও তাই-

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

"আল্লাহ নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে; যাতে রাসূলদেরকে প্রেরণের পর মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৫)।

আইন প্রণেতা, ব্যাখ্যাদাতা ও রূপকার হিসেবে

নবী ও রাসূলগণই মানব সমাজে আইন প্রণয়ন করেন, আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং প্রয়োগ করেন।

নবী ও রাসূলগণই মানব সমাজে আইন প্রণয়ন করেন, আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং প্রয়োগ করেন। কারণ মানব রচিত আইন সাময়িক শান্তি-সুখ ও স্থিতি আনতে সক্ষম হলেও চিরস্থায়ী, অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি ও স্থিতি আনতে অক্ষম। যেহেতু মানুষ রচিত আইন দূরদর্শী নয়, তাই আল্লাহর দূরদর্শী আইন মানব সমাজে প্রয়োগ, প্রণয়নের জন্য নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তাদের প্রেরণ আবশ্যক ছিল। তাই কুরআনে বলা হয়েছে-

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লেখা পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাঁধা দেয়।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

বাস্তব প্রশিক্ষণদান

কেবল তত্ত্ব ও তথ্যগত জ্ঞান থাকলেই খোদায়ী বিধান মেনে চলা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে জন্য প্রয়োজন বাস্তব ও যথাযথ প্রশিক্ষণ। নবী ও রাসূলগণ খোদায়ী বিধান নিজেরা যথাযথরূপে অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমে মানুষকে সে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُونَ

"যেমন করে আমি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল-বাকারা : ১৫১)

ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

যে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ নেই, সে সমাজে সুখ-শান্তি আসতে পারে না। তাই মানব সমাজকে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধ করে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আর সে লক্ষ্যেই তাদেরকে আসমানী কিতাব দান করেছেন যার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং যার সাম্য নীতির অনুশীলন ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি, আর তাদের নিকট কিতাব ও ন্যায়নীতি দিয়েছি যাতে মানুষ সুবিচার করে। আমি লৌহও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।" (সূরা আল-হাদীদ : ২৫)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

মানব সমাজকে সংস্কার করার লক্ষ্য নিয়েই নবী-রাসূলদের আগমন। আর ব্যাপকভাবে, এ মিশন সাধিত হবে যখন মানব সমাজের পরতে পরতে আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের গুণাবলী (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধের) প্রবেশ করবে। তাই নবী-রাসূলদের প্রধান দায়িত্ব হল, আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল-মুনকার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

মানব সমাজকে সংস্কার করার লক্ষ্য নিয়েই নবী ও রাসূলগণের আগমন। আর ব্যাপকভাবে এ মিশন সাধিত হবে যখন মানব সমাজের পরতে পরতে আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের গুণাবলী (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধের) প্রবেশ করবে।

আল-কুরআনের বাণী-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় হতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে-ইমরান :১০৪)

বস্তুত নবী ও রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা অতীব দয়াপরবশ হয়ে রহমতস্বরূপ এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা মানব জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার সঠিক পথ বাতলে দেন। আর যাবতীয় শিরক ও জাহেলী ধারণা রহিত করেন। সাথে সাথে চির সত্য-সুন্দর, শান্তি ও মুক্তির পথ ইসলামের দিকে আহবান জানান। আল-কুরআনের ঘোষণা-

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُّبِينٍ

"আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

সত্য দীনকে সকল দ্বীনের বিজয়ী করা

নবী ও রাসূলগণের প্রেরিত হবার অন্যতম কারণ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর মনোনীত দীন ও জীবন-বিধানকে অন্য সকল ধর্ম, মতাদর্শ ও ইজমের উপর প্রাধান্য, বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য। আল-কুরআনের ঘোষণা-

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

"মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করবার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।" (সূরা আত-তাওবা : ৩৩)

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নবুওয়াত ও রিসালাত মানবজাতির জন্য
   ক) বোঝা;
   খ) নিয়ামত ও রহমত;
   গ) নিয়ামত ও কঠোরতা;
   ঘ) কল্যাণকর নয়।

২. নবী ও রাসূলগণ হলেন-
   ক) আংশিক জীবন -বিধানের ধারক বাহক;
   খ) জীবন বিধান রচনাকারী;
   গ) পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক ও বাহক;
   ঘ) বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহবানকারী।

৩. ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ড হচ্ছে-
   ক) মানব রচিত আইন;
   খ) ব্রিটিশ আইন;
   গ) জাতিসংঘ সনদ;
   ঘ) আল্লাহ প্রদত্ত আইন।

৪. আমর বিল-মারুফ অর্থ কী?
   ক) অসৎ কাজে বাঁধা দান;
   খ) সৎকাজের আদেশ;
   গ) সৎপথে চলা;
   ঘ) সৎ চিন্তা করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. 'মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন নবী-রাসূল' ব্যাখ্যা করুন।
২. 'নবী ও রাসূলগণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক বাহক ছিলেন' বুঝিয়ে লিখুন।
৩. 'সাক্ষী হিসেবে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন' দলীলসহ বুঝিয়ে লিখুন।

৪. 'নবী ও রাসূলগণের দায়িত্ব হচ্ছে 'সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা' আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নবী-রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দলীলসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী ও রাসূলের আনুগত্য অপরিহার্য প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন-একথাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবীর শর্তহীন আনুগত্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- 'নবী ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়' এর ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য

তাওহীদের পর ইসলামের দ্বিতীয় মৌল বিশ্বাস হচ্ছে, নবুওয়াত-এর প্রতি (রিসালাত) বিশ্বাস। যেরূপ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে তাওহীদ হচ্ছে প্রকৃত দীন, তেমনি আনুগত্যের ক্ষেত্রেও নবুওয়াত হচ্ছে প্রকৃত দীন। নবুওয়াত (রিসালাত)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পয়গাম্বরি বা বার্তাবহন। যে ব্যক্তি একজনের বাণী অন্যজনের কাছে নিয়ে পৌছায়, তাকে বলা হয় নবী (রাসূল) বা বাণী বাহক।

ইসলামী পরিভাষায় নবী বলা হয় তাঁকে, যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছান এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে সৎপথে পরিচালনা করেন। এ কারণেই কুরআনে নবী বা রাসূলের জন্য 'পথপ্রদর্শক' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ তিনি শুধু বাণীই পৌছান না, লোকদেরকে সহজ সরল পথেও পরিচালনা করেন।

ইসলামী পরিভাষায় নবী বলা হয় তাঁকে, যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছা এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে সৎ পরিচালনা করেন।

নবীর প্রতি ঈমানই গোটা মানব জাতিকে একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। নবীগণকে অলৌকিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে। তাদের ধারণা, শিক্ষা ও কর্মপন্থায় মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআন বলে, সমস্ত নবী একই দলভুক্ত, সবার শিক্ষা ও দীন মূলত একই। একই সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে সবাই আহবান জানিয়েছেন। আর মুমিনের জন্য সবার প্রতি ঈমান আনাই আবশ্যক। যে ব্যক্তি নবীগণের মধ্য থেকে কোন একজন নবীকেও অস্বীকার করবে, সে সকল নবীর প্রতি অস্বীকৃতির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং তার অন্তরে ঈমানের চিহ্নমাত্র বাকী থাকবে না। কারণ যে শিক্ষাকে সে অস্বীকার করল তা শুধু একজন নবীরই শিক্ষা নয় বরং তা সমস্ত নবীরই শিক্ষা।

নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ

নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, শুধু ঈমান ও ইবাদাতের ব্যাপারেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলার 'জ্ঞান' ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন। তদ্বারা ভ্রান্ত ও যথার্থ পন্থাগুলোর পার্থক্য তাঁরা সুনিশ্চিতভাবেই জানতে পারতেন। এ কারণেই তাঁরা যা কিছু অর্জন বা গ্রহণ করতেন এবং যা কিছু নির্দেশ দিতেন, তা সবই করতেন আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে। সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর, এমন কি যুগের পর যুগ অভিজ্ঞতা লাভ করেও ভ্রান্তি ও যথার্থের পার্থক্য সৃষ্টিতে পুরোপুরি সফলকাম হতে পারতো না। আর কিছুটা সাফল্য অর্জিত হলেও তা অকাট্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো না। বরং তা নিছক আন্দাজ অনুমান ও অনুসন্ধানের ওপর নির্ভরশীল হতো, তাতে ভ্রান্তির আশঙ্কা অবশ্যই থেকে যেতো। পক্ষান্তরে রাসূলগণ জীবনের ক্রিয়াকাণ্ডে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং যে পথে চলবার শিক্ষা দিয়েছেন, তা করেছিলেন ওহীরজ্ঞানের ভিত্তিতে। এ জন্যই তাতে ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ কারণেই কুরআন মাজীদ বারবার নবী-রাসূলগণের আনুগত্য এবং তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের অনুসৃত পন্থাকে শরীআত, সোজাপথ ও সিরাতে মুস্তাকীম বলে অভিহিত করেছে। অন্যান্য মানুষের আনুগত্য বর্জন করে কেবল নবীদেরই আনুগত্য করার এবং তাঁদেরই পদাঙ্ক

অনুসরণের তাকিদ দিয়েছে। কারণ তাঁদের আনুগত্য হচ্ছে ঠিক আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য এবং তাঁদের অনুসরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অনুসরণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"আমি রাসূল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে।" (সূরা আন-নিসা : ৬৪)

مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সূরা আন-নিসা : ৮০)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩১-৩২)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ . وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ . إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যখন তাঁর কথা শুন তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বলে, আমরা শোনলাম, অথচ তারা কিছুই শুনে না। আল্লাহর কাছে তারাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব, সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বোঝে না।" (সূরা আল-আনফাল : ২০-২২)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

এরূপ আরও অনেক আয়াতে নবীর আনুগত্য ও অনুসরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরন্তু সূরা আহযাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যারা আখিরাতে সাফল্য এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার আশা করে, রাসূলের জীবন হচ্ছে তাদের জন্য এক অনুকরণযোগ্য আদর্শ।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"। (সূরা আল-আহযাব : ২১)

নিরংকুশ আনুগত্য

আল্লাহর পরে নিরংকুশ আনুগত্য একমাত্র রাসূল (স)-এর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। কথায়, কাজে ও চিন্তায় রাসূল (স)-এর আনুগত্যের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

কার্যত: রাসূল (স)-এর নাফরমানি করা তো দূরের কথা, মনে মনেও যদি নাফরমানীর ইচ্ছা পোষণ করা হয় তাহলেও নিশ্চিতভাবে ঈমান চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْافِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَ يْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيماً

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অত:পর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্ত:করণে তা মেনে নেয়।" (সূরা আন-নিসা : ৬৫)

রাসূলের অবাধ্যতা মানুষের জীবনে এনে দেয় চিরন্তন ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلأَرْضُ

"যারা কুফরী করছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত।" (সূরা আন-নিসা : ৪২)

নবী মানুষকে তাঁর দাসে পরিণত করেন না

নবীর আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের উপর দীন ও ঈমান নির্ভরশীল। হিদায়াত নির্ভর করে নবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আনুগত্যের উপর। মানুষ অথবা ব্যক্তি হিসেবে এ আনুগত্য যে নবীর প্রাপ্য নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। মানুষকে নিজের দাস ও গোলাম বানাবার জন্য নবীগণ প্রেরিত হননি। বরং মানুষকে আল্লাহর অনুগত করে দেওয়ার জন্যই তারা প্রেরিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَ هُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَاداً لِّي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ كُونُوْا رَبَّانِيِّينَ

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, এ কাজ তার জন্য সংগত নয় বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও।" (সূরা আলে-ইমরান : ৭৯)

নবী (স) এজন্য আগমন করেননি যে, তিনি মানুষকে তাঁর ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার আনুগত্য করতে বাধ্য করবেন। নিজের মহত্ত্ব ও বুজুর্গির প্রভাব তাদের উপর বিস্তার করবেন এবং তাঁর ব্যক্তি ক্ষমতার যাঁতাকলে তাদেরকে পিষ্ট করে এমন অসহায় করে ফেলবেন যে, তারা তার মতামতের মোকাবিলায় নিজেদের মতামত পোষণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এতো সেই গায়রুল্লাহর বন্দেগীই হল যার মূলোৎপাটনের জন্যই নবীর আগমন হয়েছে এ পৃথিবীতে। মানুষের কাঁধে মানুষের দাসত্বের যত রকম শৃঙ্খল চাপানো হয়েছে, তা সব ছিন্ন করার জন্যই তো নবীর আগমন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلأَغْلاَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"এবং সে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে যা তাদের উপর ছিলো।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

মানুষ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং বৈধ ও অবৈধের মনগড়া সীমারেখা নির্ধারণ করার যে ক্ষমতা ও এখতিয়ার করায়ত্ব করে রেখেছিল, তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নবীগণের আবির্ভাব হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تَقُولُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلاَلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ

"তোমাদের জিহবা মিথ্যারোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং এটা হারাম।" (সূরা আন-নাহল : ১১৬)

মানুষের গুকুম ও সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নেওয়ার মত যে হীনতা মানুষকে পেয়ে বসেছিল তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই নবুওয়াতের আবির্ভাব ঘটেছিল। কুরআন এ কথাই মানুকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেঃ

وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"আমাদের কেউ কাউকে যেন আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে।" (সূরা আলে-ইমরান : ৬৪)

সুতরাং একজন নবী মানুষের কাঁধের ওপর থেকে অপরের গোলামীর শিকল ছিন্ন করে তাদেরকে নিজের গোলামীর শিকল দিয়ে নতুন করে বাধবেন, এটা কি করে বৈধ হতে পারে? তিনি হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকার অন্য সবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন এবং পরক্ষণে নিজেই তা দখল করে বসবেন এবং ক্ষমতা ও আধিপত্যের আসন থেকে অন্য সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই গিয়ে তার ওপর সমাসীন হবেন, এটা কেমন করে সমীচীন হতে পারে? যে নবী ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের এই বলে তিরস্কার করেন যে, তারা নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও পীর- পুরোহিতদের আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে, তিনি কি করে বলবেন যে, এখন তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে রব বা প্রতিপালক বলে আমাকে স্বীকার কর এবং আমার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব কর?

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ

"আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার-মীমাংসা কর।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

র আইন মেনে চলতে অন্য সব মানুষ বাধ্য, তেমনি একজন মানুষ সবে স্বয়ং নবীও মেনে চলতে বাধ্য।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৫)

আল্লাহর এই আইন মেনে চলতে যেমন অন্য সব মানুষ বাধ্য, তেমনি একজন মানুষ হিসেবে স্বয়ং নবীও মেনে চলতে বাধ্য।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

"আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" (সূরা আল-আনআম : ৫০)

নবীর আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন

আনুগত্য করতে হবে, কিন্তু সেটা এ জন্য যে, হর পক্ষ থেকে তাঁকে জারী করার অধিকার দওয়া হয়েছে। শাসক প্রশাসকদের আনুগত্য তে হবে এ জন্য যে, রা আল্লাহ ও রাসূলের প্রয়োগ ও বস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত।

উপরোক্ত আয়াতগুলো ছাড়া আরও বহু আয়াত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আনুগত্য কেবল আল্লাহরই জন্য আর কারও নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর দাসত্ব এবং মানুষের ওপর মানুষের আনুগত্যের যদি অবকাশ থেকে থাকে, তবে তা মানুষ হিসেবে নয়। নবীর আনুগত্য করতে হবে, কিন্তু সেটা এ জন্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে নির্দেশ জারী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। শাসক প্রশাসকদের আনুগত্য করতে হবে এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের গুকুম প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। আলিমদের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর নির্দেশিত বৈধ অবৈধের সীমা রেখা জানিয়ে দেন। এদের মধ্যে কেউ যদি আল্লাহর গুকুম পেশ করেন তবে তার সামনে মাথা নত করে দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। এর যৌক্তিকতা বা বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারো নেই। আল্লাহর সামনে কোন মুমিনের চিন্তার স্বাধীনতা ও মতামতের স্বাধীনতা নেই। কিন্তু যদি কোন মানুষ আল্লাহর গুকুম নয়, বরং নিজের কোন মত বা ধারণা পেশ করে তবে তা মেনে নেওয়া মুসলমানের ওপর ফরয নয়। সেক্ষেত্রে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও নিজস্ব মত পোষণের অধিকার রাখে। স্বেচ্ছায় তার মতকে গ্রহণ বা স্বেচ্ছায় তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার তার

রয়েছে।

নবীর আনুগত্য শর্তহীন

দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য এই যে, রাসূলের ওপর ঈমান আনার অর্থ তাঁকে শুধু রাসূল বলে স্বীকার করে নেওয়াই নয় বরং সেই সাথে রাসূলের আনুগত্য তথা তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলাও অপরিহার্য। শুধু এ আয়াতে নয় বরং কুরআনের যেখানে-যেখানে এ আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে নির্দেশটি শর্তহীন। কোনও একটি জায়গায়ও এমন কথা বলা হয়নি যে, রাসূলের আনুগত্য অমুক-অমুক ক্ষেত্রে করতে হবে এবং ঐগুলো ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে আনুগত্যের দরকার নেই। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে, রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত এমন একজন শাসনকর্তা যার কর্তৃত্ব নিরংকুশ এবং যার নির্দেশ সর্বক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় পরিপূর্ণভাবে মান্য করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। রাসূল যদি তাদেরকে কৃষি, বাণিজ্য ও কামারগিরী ইত্যাদির কোনও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দিতেন তাহলে নির্দ্বিধায় ও বিনা সংকোচে সে নির্দেশ মেনে নিতে হতো।

রাসূল আল্লাহর পক্ষ থে নিয়োজিত এমন একজ সত্তা যার কর্তৃত্ব নিরং এবং যার নির্দেশ সর্বক্ষ সকল অবস্থায় পরিপূর্ণভ মান্য করা প্রতিটি মুমি কর্তব্য।

নবীর আনুগত্য সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়

এ রকম শর্তহীন ও সীমাহীন আনুগত্যের নির্দেশ যখন দেওয়া হয়েছে তখন সেটা যে একজন সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। কেননা অজ্ঞ কাফেররা তাঁকে নিছক একজন সাধারণ মানুষ বলেই ভাবতো। আল-কুরআন এ ব্যাপারে তথ্য প্রদান করেছে। তারা (কাফিরা) মানুষকে বলত:

هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

"সে তো তোমাদের মত একজন মানুষই।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৩)

আল-কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে-

مَا هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

"সে তো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। উপরন্তু সে চায় তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে।" (সূরা আল-মুমিনুন : ২৪)
তারা আরও বলত-

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ

"তোমরা যদি তোমাদের মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা আল-মুমিনুন : ৩৪)

বস্তুত, নবীর আনুগত্য আসলে আল্লাহরই আনুগত্য। কেননা নবী যা কিছু বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন এবং যা কিছু করেন আল্লাহর নির্দেশের অধীনেই করেন। তিনি নিজের খেয়াল-খুশীমত কিছুই বলেন না। কেবল আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করেন। কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাঁর আনুগত্যে কোন রকম পথভ্রষ্টতা বা বিপদগামী হওয়ার ভয় নেই।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলামের দ্বিতীয় মৌল বিশ্বাস হচ্ছে-
   ক. আকায়িদ; খ. রিসালাত;
   গ. পরকাল; ঘ. যাকাত।

২. রাসূল (স) এর অবাধ্যকারী হল-
   ক. ফাসিক; খ. কাফির;
   গ. মুনাফিক; ঘ. অগ্নিপূজক।

৩. প্রকৃত যালিম হচ্ছে-
   ক. যারা নামায আদায় করে না;
   খ. যারা আল্লাহর আইন অনুসারে ফয়সালা করে না;
   গ. যারা মানুষের ক্ষতি করে;
   ঘ. যারা হারাম বস্তু ভক্ষণ করে।

৪. হিদায়াত কিসের ওপর নির্ভরশীল?
   ক. ঈমানের ওপর;
   খ. ইসলামের ওপর;
   গ. মা বাবার আনুগত্যের ওপর;
   ঘ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) -এর সঠিক আনুগত্যের ওপর।

৫. পৃথিবীর সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় কীভাবে?
   ক. পুঁজিবাদের মাধ্যমে;
   খ. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে;
   গ. আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে;
   ঘ. রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. 'নবী (স)-এর আনুগত্য মানুষকে তাঁর গোলামে পরিণত করে না'-ব্যাখ্যা করুন।
৩. 'আল্লাহর পর নিরংকুশ আনুগত্য একমাত্র মহানবী (স)-এর জন্য' প্রমাণ দিন।
৪. ব্যাখ্যা করুন-'নবী (স)-এর আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন।'
৫. 'নবীর আনুগত্য সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়', বুঝিয়ে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ কিনা, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলগণের স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল তা বলতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেন।

নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির মধ্য হতে সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তিদের নবী ও রাসূল নির্বাচন করেছেন। মানব সমাজে অবস্থান করেও তাঁরা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও সত্যবাদী ছিলেন। তবে নবী-রাসূলগণ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বা পাপমুক্ত ছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। চারটি বিষয়ে এ মতভেদ লক্ষ করা যায়। যথা-

১. বিশ্বাসগত দিক

মুসলিম পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নবী-রাসূলগণ কুফর এবং বিদ্আত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তবে ভ্রান্তমতাবলম্বীরা নবী-রাসূলগণের দ্বারা কুফরী কাজ সংঘটিত হওয়াকে বৈধ মনে করেন। তাদের মতে নবী-রাসূলদের দ্বারা পাপকার্য সংঘটিত হওয়া বৈধ। আর প্রত্যেকটি পাপকার্য তাদের নিকট কুফরের সমতুল্য। এমতাবস্থায় তাদের মতে নবী-রাসূলদের দ্বারা কুফরী হওয়া সম্ভব। রাফেজীরা নবী-রাসূলদের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে কুফরী করা জায়েজ বলে মনে করে।

নবী ও রাসূলগণ সকল গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শবান অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও সত্যবাদী ছিলেন।

আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তাইয়্যিব আল-বাকিল্লানী আল-আশআরী বলেন, "আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি তিনি কাররামিয়াদের সম্পর্কে বলেন, তারা দীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের মিথ্যা কথা বলা জায়েয মনে করেন।" আর এটা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরও অভিমত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত হল, নবী-রাসূলগণ অন্যান্য ক্ষেত্রের মত তাবলীগের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার মিথ্যা বলেননি এবং মিথ্যা বলা তাঁদের জন্য জায়েয নয়।

২. আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত সকল বিধি-বিধান সম্পর্কিত দিক

মুসলিম পণ্ডিতগণ এবং ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেন, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যে শরীআত বা বিধান লাভ করেন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন এবং খিয়ানত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইচ্ছাকৃতভাবেও নয়, অনিচ্ছাকৃতভাবেও নয়। অন্যথায় শরীআতের বিধানের উপর সামান্যতম বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা মানুষের থাকত না।

৩. ইজতিহাদ সম্পর্কিত দিক

মুসলিম পণ্ডিতগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নবী-রাসূলগণের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুলত্রুটি হওয়া জায়েয নয়। ফাতওয়া ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৪. তাঁদের কাজ কর্ম ও পরিস্থিতিগত দিক

এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ মতভেদ করেছেন এবং তারা পাঁচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছেন। যথা:

ক. বাতিলপন্থী হাশবিয়া সম্প্রদায়ের মতে নবী-রাসূলগণের দ্বারা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কবীরা ও সগীরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে।

খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে নবী-রাসূলগণ ইচ্ছাকৃত কবীরা গুনাহ, নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্ব বিরোধী সগীরা গুনাহ থেকেও মুক্ত।

গ. নবী-রাসূলদের পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা এবং সগীরা গুনাহ করা বৈধ নয়। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন পাপ হয়ে যায় বা কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল হয়ে যায় তবে তা বৈধ। আর এ মতবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন আবু আলী আলজুবায়ী। তিনি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একজন ইমাম ছিলেন।

ঘ. নবী-রাসূলগণ কবীরা এবং সগীরা কোন প্রকারের গুনাহই করতে পারেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গুনাহ করা তো দূরের কথা, অনিচ্ছাকৃতভাবে তা তাবিল (ধর্মের ব্যাখ্যা) করার সময়ে কোন গুনাহ করতে পারেন না। কিন্তু ভুলবশত গুনাহ প্রকাশ পাওয়া বৈধ। অতপর তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তাঁদের ভুলত্রুটির জন্য। যেহেতু তাঁদের জ্ঞান পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। আর এ মতবাদের প্রবক্তা হলেন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইয়াসার আল-নাজ্জাম। তিনিও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একজন ইমাম।

ঙ. নবী-রাসূলগণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ভুলবশত যাবতীয় কবীরা গুনাহ এবং সগীরা গুনাহ হতে পবিত্র। শিয়া মতাবলম্বীগণ এ মতের অনুসারী।

ত প্রাপ্তির সময় থেকে রাসূলগণকে অবশ্যই তীয় পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। াত লাভের পূর্বে পাপ জ থেকে পবিত্র থাকা আবশ্যক নয়। তবে ত আল্লাহ তাঁদেরকে াত লাভের পূর্বেও যে ান প্রকার পাপ থেকে হেফাজত করেন।

নবী-রাসূলগণের পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার সময়কাল

নবী-রাসূলগণের যাবতীয় পাপ কাজ থেকে পবিত্রতা কখন থেকে আরম্ভ হয় এ সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ববিদগণের মতামত হচ্ছে-

১. কেউ কেউ মনে করেন, নবী-রাসূলগণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্র।

২. অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের মতে, নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে নবী-রাসূলগণকে অবশ্যই যাবতীয় পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকা আবশ্যক নয়। তবে সাধারণত আল্লাহ তাঁদেরকে নবুওয়াত লাভের পূর্বেও যে কোন প্রকার পাপ থেকে হেফাজত করেন।

নবী-রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়ার দলীল

যারা মনে করেন, নবী-রাসূলগণ নবুওয়াত লাভের সময়কাল থেকে সকল প্রকার ইচ্ছাকৃত কবীরা এবং সগীরা গুনাহ থেকে পবিত্র, তাদের দাবির সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হল।

১. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয় তাহলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্ত হয়ে যান এবং তাঁরা ভবিষ্যতে শাস্তির জন্য বিবেচিত হন যা গুনাহগার উম্মতের অবস্থা থেকেও কঠিন। আর এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, একজন নবী মানুষকে হিদায়াতের পথে আহবান করার পরিবর্তে নিজেই পাপে লিপ্ত হয়ে পড়বেন। সুতরাং নবী-রাসূলদের দ্বারা পাপ কার্য সাধিত হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

   আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল, "বান্দাদের উপর নবুওয়াত এবং রিসালাতের নিয়ামত।" যিনি এ নবুওয়াত বা রিসালাত লাভে ধন্য তাঁর দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হওয়া অতি জঘন্য ও ঘৃণিত কাজ। নবী-রাসূলগণ উম্মতের চেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেন। এমনটি কখনো হতে পারে না যে, একজন নবী বা রাসূল আল্লাহর কাছে সম্মানিত থাকবেন এবং উম্মতের মধ্যে তাঁর অবস্থান নিম্নে থাকবে? এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলগণ সমস্ত পাপ কাজ থেকে পবিত্র।

২. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা পাপ কাজ সম্পাদিত হতো তাহলে তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতো না। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

   "হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে।" (সূরা আল-গুজুরাত : ৬)

   ফাসেক বা পাপাচারী ব্যক্তির সংবাদ পরীক্ষা করে দেখার কথা আয়াতে নির্দেশ এসেছে এবং ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য যাচাই করা এবং স্থগিত করার আদেশ হয়েছে।

   সুতরাং নবীদের দ্বারা পাপ কার্য সাধিত হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা দুনিয়ায় তাঁরা যদি পাপাচারি সাব্যস্ত হন এবং যদি তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে কিয়ামত দিবসে তাঁদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স)

কিয়ামত দিবসে তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে তোমরা সাক্ষী হও মানবমণ্ডলীর জন্য। আর রাসূল (স) সাক্ষী হয় তোমাদের জন্য।" (সূরা আল-বাকারা : ১৪৩)।

যদি কিয়ামত দিবসে রাসূল (স) তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষী হন, তাহলে কিভাবে সম্ভব তাঁর কাছ থেকে পাপ সংঘটিত হওয়া যার ফলে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

৩. নবী-রাসূলগণের দ্বারা যদি পাপ কাজ সাধিত হতো তাহলে তাঁদেরকে শাসন করা আবশ্যক হয়ে পড়ত। কেননা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। নবী-রাসূলগণকে শাসানো বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিশম্পাত করেন।" (সূরা আল-আহযাব : ৫৭)

নবী-রাসূলগণ যেহেতু শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেহেতু তাঁদের দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

৪. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা কোন পাপাচার সংঘটিত হয় তাহলে কিভাবে আমরা তাঁদের অনুসরণ করব অথচ আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যদি তাঁদের কাছ থেকে পাপ সংঘটিত হতো তাহলে আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য আদেশ করা হতো না। নবী-রাসূলগণ আসবেন শরীআত নিয়ে আর উম্মত তা গ্রহণ করবে না, বা গ্রহণ করার জন্য আদিষ্ট হবে না এটাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

যদি নবী রাসূলগণের কোন পাপাচার সংঘটি তাহলে কিভাবে আম তাঁদের অনুসরণ করব আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য করা হয়েছে।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কোন ফাসেক পাপাচারী ব্যক্তির অনুসরণের জন্য আদেশ করেন না এবং করতে পারেন না। যেহেতু নবী মুহাম্মদ (স)-এর অনুসরণ করার আদেশ হয়েছে, সেহেতু এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (স) সকল পাপ কাজ থেকে পবিত্র ছিলেন।

৫. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা কোন পাপাচার সংঘটিত হতো, তাহলে তাঁরা আল্লাহর শাস্তি লাভের অধিকারী হয়ে যেতেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর দেওয়া সীমারেখা লংঘন করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা আন-নিসা : ১৪)

নবী-রাসূলগণ জান্নাতে থাকবেন আল্লাহ তা'আলার এ কথার স্বীকৃতি স্বরূপ নবী-রাসূলগণ পাপ কাজ করতে পারেন না। কেননা যারা জান্নাতী হবেন তারা পাপ কাজ থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকবেন। উম্মতে মুহাম্মদী এ বিষয়ে একমত যে নবী-রাসূলগণ পাপ কাজ করতে পারেন না এবং তাঁদের দ্বারা পাপ কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

৬. নবী-রাসূলগণ মানব জাতিকে তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আর যদি তাঁরাই আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দেন এবং পাপাচারে লিপ্ত হন, তাহলে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সেই আদেশের ভেতর এসে গেলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ

তা'আলা নিন্দাবাদ করে বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ . كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বল? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" (সূরা আস-সাফ : ২-৩)

এ ধরনের কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত শুয়াইব (আ) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি এ জাতীয় কাজ থেকে পবিত্র ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُ

"আর আমি চাই না যে, তোমাদের যা থেকে নিষেধ করছি আমি নিজেই সে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি।" (সূরা হূদ : ৮৮)

এ আয়াত দ্বারাও নবী-রাসূলদের পাপাচার থেকে পবিত্র হওয়া প্রমাণ করা যায়।

সূলগণ আল্লাহ কর্তৃক ীত। তাঁরা সৎলোক। দের কাছ থেকে কোন ার পাপ সংঘটিত হয় না।

৭. নবী-রাসূলগণ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। তাঁরা সর্বাপেক্ষা সৎলোক। তাঁদের কাছ থেকে কোন পাপ সংঘটিত হয় না। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ ٱلۡأَخۡيَارِ

"আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা সোয়াদ : ৪৭)

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলগণ সকল কাজ কর্মে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং নবী-রাসূলদের দ্বারা পাপ কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম এবং ইমরান -এর বংশধরদেরকে মনোনীত করেছেন সমস্ত জগৎবাসীর উপর।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর ব্যাপারে বলেন:

إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي

"আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানো এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বৈশিষ্ট্য দান করেছি।" (সূরা আল-আরাফ : ১৪৪)

৮. উলামায়ে কিরামগণ বলেছেন, নবী ও রাসূলগণ ফেরেশতাদের থেকেও উত্তম। আর এ বিষয়টি দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, ফেরেশতাগণ কোন গুনাহের কাজে অগ্রসর হন না। নবী-রাসূলদের দ্বারা যদি কোন পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতো তাহলে ফেরেশতাদের থেকে উত্তম হওয়া নবী-রাসূলদের জন্য অসম্ভব হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِينَ كَٱلۡفُجَّارِ

"আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেব? আমি কি খোদাভীরুদের পাপাচারীদের সমান করে দেব?" (সূরা সোয়াদ : ২৮)

নবীগণ ফেরেশতাদের থেকে উত্তম হওয়ায় একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা কোন কবীরা কিংবা সগীরা গুনাহ অনুষ্ঠিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকল পাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নবী ও রাসূলগণ শুধু তাবলীগের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে থাকেন এটি কাদের অভিমত?
   ক. মুরজিয়াদের;
   খ. মুতাযিলাদের;
   গ. হানাফীদের;
   ঘ. কাররামিয়াদের।

২. 'নবী ও রাসূলগণের ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার দরকার নেই' এ মতটি পোষণ করেন-
   ক. আশআরিয়াগণ;
   খ. যায়েদিয়াগণ;
   গ. শিয়া সম্প্রদায়;
   ঘ. হাশবিয়াগণ।

৩. আবু আলী আল-জুবায়ী কে ছিলেন?
   ক. হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত পণ্ডিত;
   খ. কাররামিয়া সম্প্রদায়ের একজন ইমাম;
   গ. বাহাইয়া সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত;
   ঘ. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একজন ইমাম।

৪. 'নবী ও রাসূলগণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনভাবেই কবীরা বা সগীরা গুনাহ করতে পারেন না' এটি কার অভিমত?
   ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর;
   খ. ইমাম মালিক (র)-এর;
   গ. ইবনুল আরাবীর;
   ঘ. ইবনে ইয়াসার আল-নাজ্জামের।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা করুন।
২. নবী ও রাসূলদের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ ও পরিস্থিতিগত দিক নিয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে যে মত পার্থক্য দেখা যায়, তা আলোচনা করুন।
৩. 'নবী ও রাসূলগণ নবুওয়াত লাভের সময়কাল থেকে নিষ্পাপ ছিলেন' এ মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

বিশদ রচনামূলক-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হযরত আদম (আ) সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- হযরত আদম (আ) নবী ও রাসূল ছিলেন তা প্রমাণ করতে পারবেন;
- জিন ও ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-হাদীসের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত সময়কাল সম্পর্কে মুতাযিলাদের মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হযরত আদম (আ) প্রথম মানব ও নবী

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী ছিলেন।

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় ইচ্ছাকে পূরণ করার লক্ষ্যে জিন ও ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে জান্নাতে বসবাস করেন। আল্লাহর একটি নির্দেশ পালনে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হন। আল্লাহ তাঁর ত্রুটি-ক্ষমা ও তাওবা কবুল করেন। মানবজাতির জন্য তাঁকে নবী ও প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। তাঁর ওপর একাধিক আসমানী পুস্তিকা বা সহীফা অবতীর্ণ হয়। এগুলোর মধ্যে যে বিধি-বিধান দেওয়া হয় তিনি ও তাঁর বংশধরগণ-এর অনুসরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন কাবা ঘর নির্মাণ করার জন্য এবং উক্ত ঘর তওয়াফ ও আল্লাহর যিকির করার জন্য। এ আদেশ প্রাপ্তির পর তিনি কাবা ঘর নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করলেন। পবিত্র মক্কা নগরীতে এ ঘর নির্মাণে জিবরাইল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতা তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছিলেন। কাবা ঘর নির্মাণ করার পর হযরত আদম (আ) সেখানে নামায আদায় করেন এবং কাবা ঘর তাওয়াফ ও আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।

জিন ও ফেরেশতাদের উপর আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। এ জগতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও শাসন কাজ পরিচালনা এবং শৃংখলা বিধানের জন্য যাবতীয় বিষয় তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করে ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই। এতে ফেরেশতাগণ আপত্তি করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করলেন এবং তাঁর প্রতিনিধি অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। এ জগতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও শাসন কাজ পরিচালনা এবং শৃংখলা বিধানের জন্য যাবতীয় বিষয় তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে আদেশ করলেন, ওই সব বস্তুর নাম ফেরেশতাদের বলে দেওয়ার জন্য। হযরত আদম (আ) সমস্ত বস্তুর নাম ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিলেন, যা তারা জানত না। এমনকি আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মানব জাতির সকল ভাষাও জানিয়ে দিলেন, যা দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করবে। আরো জানিয়ে দিয়েছিলেন বস্তুসমূহের সেই সব নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ যা ফেরেশতাগণও জানত না। এই নিগূঢ় তত্ত্বসমূহকে আল-কুরআনে আসমা বা নামসমূহ বলে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই নাম বলে তিনি শুধু দ্রব্যসমূহের নাম পরিচিতিই বুঝাননি। কেননা শুধু নাম জানলেই তো আদমের শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না। আসলে এই নাম বলতে দ্রব্যসমূহের নাম এবং দ্রব্যসমূহের গুণ ও নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বুঝায়। তার অর্থ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি কর্মের নিগূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্ব ও দ্রব্য গুণসমূহ হযরত আদম (আ)-কে জানিয়েছিলেন। আদমকে এই নামসমূহ শিক্ষাদানের ফলেই বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব, সে সংক্রান্ত খবরাদি ও নিয়ম কানুন এবং জীবনের ঘটনাবলী জানা-বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

যেহেতু হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে ফেরেশতা ও জিন উভয় জাতির যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, তাই উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ফেরেশতা ও জীন-এ দু'জাতির উপর প্রমাণ করার জন্য হযরত আদম (আ)-কে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করতে চাইলেন। আর ফেরেশতাদের আদেশ করলেন হযরত আদম (আ)-কে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ সম্মান সূচক সিজদা করার জন্য। ইবলীস ব্যতীত সকল ফেরেশতা হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করলেন।

যেহেতু হযরত আদম (আ) এর মধ্যে ফেরেশতা ও জিন উভয় জাতির যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে তাই উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর এটাই প্রমাণ করে যে, হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন।

আল কুরআনের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন। আর এটা হল জমহুর উলামাগণের সর্বসম্মত অভিমত। হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা, ঈসা (আ) সহ অন্যান্য নবীর ক্ষেত্রে আল-কুরআন প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, তাঁরা নবী ছিলেন। হযরত আদম (আ)-এর বর্ণনা আল-কুরআনে রয়েছে। তাঁকে কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ সম্বোধনের মাধ্যমে শরীআতের বিধি- বিধানও দেওয়া হয়েছে। যেমন তাঁকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে তাঁর জন্য হালাল-হারামের বিধান ও দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

হযরত আদম (আ)-এ নবী হওয়া প্রমাণিত।

وَقُلْنَا يَاآدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ

"আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা হতে স্বচ্ছন্দে আহার করতে থাক। কিন্তু এ গাছের নিকটেও যাবে না, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা আল-বাকারা : ৩৫)

অত্র আয়াতে আদম (আ)-এর ওহী প্রাপ্তির প্রমাণ রয়েছে। কেবল নবীগণই ওহী দ্বারা এরূপ সরাসরি আদিষ্ট হয়ে থাকেন। সুতরাং এ আয়াত হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করে। পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত আছে:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ

"আল্লাহর ইবাদাত করবার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি।" (সূরা আল-নাহল : ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।" (সূরা আর-রাদ : ৭)

হযরত আদম (আ)-এর যুগে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন এবং শরীআত প্রচার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনিই তাঁর সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩৩)

সূরা আলে-ইমরান-এর এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, اصطفى শব্দের অর্থ এখানে নবুওয়াত এবং রিসালাত-এর জন্য নির্বাচন করা বুঝান হয়েরছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قُلْنَا ٱهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

"আমি বললাম, তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত ও হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ৩৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার হিদায়াতদানের ওয়াদা রয়েছে, যা রিসালাতের ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

"এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।" (সূরা ত্বাহা : ১২২)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাছাই করে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর তাওবা কবুল করেছেন। যার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত এবং রিসালাতের জন্যে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তিনি নবী ও রাসূল।

হাদীস দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ

হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত হাদীস দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন:

أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر . وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى يومئذ ادم وغيره الا تحت لوائى . وأنا أول من تنشق به الارض ولا فخر.

"আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের নেতা হব, এতে আমার গর্ব নেই। আমার হাতে প্রশংসার পতাকা থাকবে, এতে আমার গর্ব নেই। আর সেদিন নবীদের মধ্য হতে আদম (আ) ও অন্য সকল নবী আমার ঝাণ্ডার নীচে অবস্থান করবেন। আর আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি মাটি থেকে উত্থিত হবো, এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই।" (তিরমিযী)

এ হাদীসে হযরত নবী করীম (স) আদম (আ)-কে নবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন। হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

قلت يارسول الله أرأيت أدم نبيا كان؟ قال : نعم، كان نبيا ورسولا، كلمه الله، قال له : ياادم اسكن أنت وزوجك الجنة.

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বলুন আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন হ্যাঁ,

তিনি নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তিনি আদমকে বলেন, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।"

হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের সময়কাল

হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে হযরত আদম (আ)-এর বস্তুসমূহের নাম শিক্ষা গ্রহণ প্রমাণ করে যে, তিনি নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে নামসমূহ শিক্ষা দেন, তখন থেকেই তিনি নবী ছিলেন। মুতাযিলাদের মতে তিনি সর্বপ্রথম হযরত হাওয়া (আ)-এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মুতাযিলাদের এ মতের বিপরীতে অনেকে বলেছেন, যদি তিনি সে সময় নবী হিসেবে প্রেরিত হতেন, তবে কোন না কোন একজনের নিকট প্রেরিত হতেন। হয়ত ফেরেশতার প্রতি প্রেরিত হতেন অথবা মানুষের প্রতি অথবা জিনদের প্রতি। ফেরেশতাদের প্রতি প্রেরিত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা মুতাযিলাদের নিকট ফেরেশতা মানুষ থেকে উত্তম। আর এটা সমর্থনযোগ্য নয় যে, একজন নিকৃষ্ট জীব উৎকৃষ্টের প্রতি প্রেরিত হবেন। কেননা উম্মত হবে রাসূলের অনুসারী। আর এটা কিভাবে সম্ভব যে, একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মর্যাদাহীনের অনুসারী হবেন, যা নিয়মেরও পরিপন্থী। আর একথা স্পষ্ট যে, কোন মানুষ তখনই কোন কথা গ্রহণ করবে, যখন সে তার স্বজাতির হয়।

আর একথা বলাও ঠিক হবে না যে, তিনি মানুষের উপর প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা তখন হযরত হাওয়া (আ) ব্যতীত আর কোন মানুষ ছিল না। আর হযরত হাওয়া (আ) আল্লাহর আদেশ-নিষেধ হযরত আদম (আ) থেকে শিক্ষা করেননি। যেমন- তা'আলা বলেন:

وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"তোমরা এই গাছের নিকটবর্তীও হয়ো না, যদি হও, তবে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আল-বাকারা : ৩৫)

আর এ রকম ধারণা করাও ঠিক হবে না যে, হযরত আদম (আ) জিনদের উপর নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা তখন আকাশে একজন জিনও ছিল না।

এ আলোচনা থেকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণিত হয়, তবে তিনি কখন নবী হসিবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক মত হল যে, তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার পর তাঁর বংশের লোকদের উপর নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আর মুসলানদের মধ্যে ইজমা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ)-ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল ছিলেন। তবে হযরত আদম (আ)- এর উপর আল-কুরআানের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ শরীআত অবতীর্ণ হয়নি। প্রয়োজন অনুসারে বিধি- বিধান নাযিল হয়েছে। এ কারণে অনেকে হযরত আদম (আ)-কে শুধু নবী না বলে নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করেছেন। তাঁর নবুওয়াত অস্বীকারকারী কাফির।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে কোথায় সৃষ্টি করেন?
   ক. আকাশে;
   খ. জান্নাতে;
   গ. লাওহে মাহফুজে;
   ঘ. পৃথিবীতে।

২. হযরত আদম (আ) যে প্রথম নবী তাঁর প্রমাণ-
   ক. তিনি প্রথম জান্নাতে বসবাস করেন;
   খ. তিনি প্রথম পৃথিবীতে অবতরণ করেন;
   গ. তিনি প্রথম সহীফা লাভ করেন;
   ঘ. তিনি প্রথম কাবা ঘর নির্মাণ করেন।

৩. কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের নেতা হবেন-
   ক. হযরত আদম (আ);
   খ. হযরত ইবরাহীম (আ);
   গ. হযরত মুহাম্মদ (স);
   ঘ. হযরত ঈসা (আ)।

৪. ইজমা বলতে বুঝায়-
   ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মতামতকে;
   খ. খুলাফায়ে রাশেদীনের মতামতকে;
   গ. উমাইয়া খলীফাদের রায়কে;
   ঘ. সাহাবা কিরামের সম্মিলিত রায়কে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত আদম (আ)-এর পরিচয় দিন।
২. হযরত আদম (আ) কী জিন ও ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন? বর্ণনা করুন।
৩. আল-কুরআনের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৪. আল-হাদীসের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৫. হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের সময়কাল সম্পর্কে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতামত বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত আদম (আ) কী নবী ও রাসূল ছিলেন? প্রমাণসহ আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

পাঠ-৬

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- আল কুরআনের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অলৌকিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাঁর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- মিরাজ বা ঊর্ধ্বগমনর ঘটনার দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুওয়াতের প্রমাণ দিতে পারবেন;
- হাদীস দ্বারা নবুওয়াতের প্রমাণ করতে পারবেন;
- যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আল-কুরআনে বেশ কিছু সংখ্যক নবী-রাসূলের বর্ণনা এসেছে। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে আল-কুরআনে দীর্ঘ আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের অনুকূলে অসংখ্য যৌক্তিক প্রমাণ রয়েছে।

আল-কুরআন দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن بَعْدِهِۦ

"আমি তো তোমার নিকট ওহী পাঠিয়েছি যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৩)

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

"এছাড়া এমন অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি তোমাকে ইতোপূর্বে শুনিয়েছি এবং এমন অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। আমি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের প্রেরণের পর আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৪-১৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব : ৪০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সূরা সাবা : ২৮)

কুরআনে আরো বর্ণিত আছে:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

"সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম জীবন-ধমনী। অত:পর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। (সূরা আল-হাককাহ : ৪৪-৪৭)

এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মহানবী (স) ওহী লাভ করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়তের প্রমাণ

ী (স) এর মুজিযা বা অলৌকিততা তাঁর ওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ। া আল-কুরআন প্রচার ন এবং আরবের বড়-পণ্ডিতদেরকে তা দ্বারা লঞ্জ করেছেন। অথচ রা বিজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া ত্ত্বেও আল-কুরআনের প কোন বাক্য বা সূরা করতে সক্ষম হয়নি।

মহানবী (স)-এর মুজিযা বা অলৌকিকতা তাঁর নবুওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ। হযরত মুহাম্মদ (স) নবুওয়াতের দাবি করেছেন এবং স্বীয় দাবীর অনুকূলে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ও বিষয় প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এসব অলৌকিক ঘটনা বা মুজিযা দু'ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যথাঃ

১. তিনি আল-কুরআন প্রচার করেছেন এবং আরবের বড়-বড় পণ্ডিতদেরকে তা দ্বারা চ্যালেঞ্জ করেছেন। অথচ তারা বিজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনের অনুরূপ কোন বাক্য বা সূরা রচনা করতে সক্ষম হয়নি, যদিও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। আল-কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে:

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩)

বলাবাহুল্য, আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কোন যুগের মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়নি বরং সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে, ليس هذا من كلام البشر অর্থাৎ 'এটা কোন মানুষের কথা নয়।' আল-কুরআনের এ অলৌকিকতাই হযরত মুহাম্মদ (স) -এর নবুওয়াতের প্রমাণ।

২. মহানবী (স) সাধারণ নিয়মের বাইরে এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যেমন: আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ, উৎপীড়িত উষ্ট্রীর অভিযোগ তাঁর কাছে দায়ের এবং পাথরের সাথে, গাছ-পালার সাথে এমনকি চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে তাঁর কথা বলা, তাঁর বিরহে খেজুর গাছের শুকনা কাণ্ডের ক্রন্দন করা (যার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তিনি মসজিদে নববীতে খুতবা দান করতেন) তাঁর হাতেই স্বল্প খাদ্যে বহু লোকের তৃপ্তির সাথে ক্ষুধা নিবৃত হওয়া, সামান্য পানি দ্বারা বহু লোকের অযু, গোসলসহ ও তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া, তাঁর উপর মেঘমালার ছায়াদান ইত্যাদি। এসব বাস্তব ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করে।

হযরত মুহাম্মদ (স) উম্মী হওয়া তাঁর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

"তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং নিজ হাতে কোন কিতাবও লিখনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" (সূরা আল-আনকাবুত : ৪৮)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনাকালের আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা, পূর্ববর্তী নবীদের জীবন কাহিনী, অতীতের ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস, আদিম জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গভীর বিস্তৃত জ্ঞানরাজি উম্মী নবীর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে, তা ওহী ছাড়া আর কোন উপায়ে তাঁর অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (স) যদি উম্মী না হতেন, তাহলে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করতো যে, তাঁর কথাগুলো জ্ঞান প্রসূত। কিন্তু নবী উম্মী হওয়াতে এ ধরনের কোন সন্দেহের আদৌ কোন অবকাশ নেই।

মিরাজ বা ঊর্ধ্বগমন মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মাসজিদুল হারাম থেকে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আল-ইসরা : ১)

৬২০ খ্রিস্টাব্দের রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে নবী করীম (স) আল্লাহ তা'আলার আহবানে বোরাক যোগে মসজিদে হারাম হতে বায়তুল মাকদিস গমন করেন। সেখান থেকে মানব জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে ঊর্ধ্বজগতে গমন করে আরশ, কুরসী, লাওহ-কলম, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি পরিভ্রমণ শেষে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসেন। এ ঘটনাটি মহানবী (স) এর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

৬২০ খ্রিস্টাব্দের রজ
মাসের ২৬ তারিখ দি
রাতে নবী করীম (স
আল্লাহ তা'আলার আ
বোরাক যোগে মসজি
হারাম হতে বায়তুল
মাকদিস গমন করেন
হতে মানব জ্ঞানের
অতিক্রম করে ঊর্ধ্বজ
গমন করে আল্লাহর
লাভ করে আবার ভূ-
ফিরে আসেন। এ ঘ
মহানবী (স)-এর
নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রম

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ . ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ . وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ . ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ . فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ . مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ . أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ . وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ . عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ .عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ

"নক্ষত্রের কসম, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এ তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অত:পর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন, যা সে দেখেছে, তার অন্তর তা অস্বীকার করেনি; সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী বরই গাছের নিকট, যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া।" (সূরা আন-নাজম : ১-১৫)।

মহানবী (স)-এর পরিচ্ছন্ন জীবন তাঁর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ

মহানবী (স)-এর শৈশবকাল থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ৪০ বছর এক বাস্তব জীবন আরববাসীদের সাথেই কাটিয়েছেন। মহানবী (স)-এর জীবন তাদের সামনে দ্বি-প্রহরের সূর্যের মতো ঝলমল করছে। তাঁর কথাবার্তা, চাল-চলন, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, বিয়ে-শাদী, সামাজিকতা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ-কর্ম তাদের সাথেই সম্পর্কিত ছিল। তাঁর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাদের অজানা ছিল না।

মহানবী (স)-এর নবুওয়াত-পূর্ববর্তী জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য, সুন্দর কার্যাবলী, সর্বাত্মক সততা, সত্যবাদিতা, মানবতাবোধ, দয়া-মায়া, উন্নত চিন্তা, সাহসিকতা, প্রতিভা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, দৃঢ়চিত্ততা ইত্যাদি অতীব উচ্চাঙ্গের সুকুমার বৃত্তি এবং নিরেট নিরক্ষতার প্রেক্ষাপটে এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ওহী নাযিল হওয়া নবুওয়াতের সত্যতার এমন এক জ্বলন্ত প্রমাণ, যাকে অস্বীকার করা যে কোন বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে অসম্ভব।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত পরবর্তী জীবন নবুওয়াতের প্রমাণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত পরবর্তী জীবন ও নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনের ন্যায় পরিচ্ছন্ন। তিনি অতীব উচ্চাঙ্গের জীবনাচার, মুমিনদের জীবনে তাঁর শিক্ষার বিপ্লবাত্মক প্রভাব, সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত আকীদা বিশ্বাস, অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইবাদাত, উৎকৃষ্টতম চরিত্র এবং মানব জীবনের জন্য সর্বোত্তম নীতিমালা ও বিধান শিক্ষাদান কথায়-কাজে পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য এবং সব ধরনের বিরোধিতা ও বাধা বিপত্তির মোকাবিলায় অটুট মনোবল ও অবিচল নিষ্ঠা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর নবুওয়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

নবীর বাস্তব ভিত্তিক সুষম নীতিমালা প্রবর্তন তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ

স)-এর বাস্তব ভিত্তিক নের সকল ক্ষেত্রে সুষম ালা প্রবর্তন, যা আজ কে দেড় হাজার বছর কল্পনাতীত ছিল। তিনি ল বিশ্বাসীদেরই নেতা নন বরং অবিশ্বাসীরাও ক শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে স্বীকার করেন।

নবী (স)-এর বাস্তব ভিত্তিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুষম নীতিমালা প্রবর্তন, যা আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে কল্পনাতীত ছিল। এই উম্মী ব্যক্তিটি অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেও আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও সারা দুনিয়ার মহান নেতা হিসেবে স্বীকৃত। তিনি কেবল বিশ্বাসীদেরই নেতা নন বরং অবিশ্বাসীরাও তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে স্বীকার করেন। কেননা তিনি বিশ্ববাসীর চিন্তাধারার মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তিনি ভাববাদিতা, বস্তুবাদিতা, সৃষ্ট বস্তুর পূঁজা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে যুক্তিবাদ ও বাস্তববাদ এবং যথার্থ আল্লাহ-ভীতি ভিত্তিক ধার্মিকতার দিকে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি বিশ্বের প্রচলিত চিন্তাধারাকে পাল্টে দিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন অর্থনীতি, সামজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, কুটনীতি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সকল দিক ও বিভাগের জন্য প্রবর্তন করেছেন সুষম মূলনীতি, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার চালিকানীতি, যা পূর্বে বিশ্ব মানবের কাছে অকল্পনীয় ছিল। আর এটা আল্লাহ প্রদত্ত নবুওয়াতের জ্ঞান ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং মহানবী (স)-এর বাস্তব ভিত্তিক সুষম নীতিমালা প্রবর্তন তাঁর নবুওয়াতের উৎকৃষ্ট দলীল।

জাহিলিয়া যুগের সকল অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে বৈপ্লবিক পবির্তন সাধন মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) প্রায় চল্লিশ বছরকাল জাহেলী যুগে অতিবাহিত করেছেন। যেখানে কোন নীতি নৈতিকতার বালাই ছিল না। সমাজ অন্যায়, অবিচার, নৈরাজ্য, মিথ্যা, ঝগড়া, বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে ভরে গিয়েছিল। তখন সমগ্র বিশ্বে মানবতার চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। যে জাতির মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সে জাতির কোন শিক্ষা, সংস্কৃতি, তাহযীব- তামাদ্দুন ও মানবতাবোধ বলতে কিছুই ছিল না। এমন একটি জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বড় হয়েও তিনি অতীব পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার পর তাঁর জীবনে আসে এক মহাবিপ্লব। চারদিকের ঘুর্ণায়মান নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে মুক্তির আলোক-রশ্মি তিনি নিয়ে এলেন। তিনি তাদের প্রতিটি লোকের চরিত্র এমনভাবে গঠন করলেন এবং তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় এমনভাবে শিক্ষিত করে তুললেন যে, তারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সমগ্র বিশ্বকে ঈমান ও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতির আলোকে আলোকিত করে তোলেন। সমকালীন বিশ্বের অধিকাংশ সচেতন মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁর আদর্শের অনুসারী হয়েছিল। আর গোটা দুনিয়ায় তার আদর্শের বিপ্লব ঘটেছিল। এমন ব্যক্তিত্ব নবুওয়াত ব্যতীত কল্পনাই

করা যায় না।

বিশ্বের সকল মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) মানবতার ইতিহাসে এক আত্যাশ্চর্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যার তুলনা ইতিহাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইতিহাসে যারা মহামণীষী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন তাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুকাবিলায় দাঁড় করালে তাঁর সামনে ক্ষুদে বামুনটির মতো মনে হবে। বিশ্ব মণীষীগণের মধ্যে একজনও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না যার শ্রেষ্ঠ ও উন্নত গুণাবলী জীবনের একটি বা দু'টি বিভাগ ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত হতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) ই কেবল ব্যতিক্রম। তাঁর মধ্যে সমস্ত গুণাবলী একত্রিত হয়েছে। এ ধরনের সর্বগুণের অধিকারী দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এমন ব্যক্তিত্ব নবী না হয়ে পারেন না।

সর্বোপরি একজন লোক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করবেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চরিত্রে এতসব বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণের সমাবেশ ঘটাবেন এবং দীর্ঘ তেইশ বছর পর্যন্ত তাঁকে সুযোগ দিয়ে দুনিয়ায় প্রচলিত সমস্ত মতবাদের উপর তাঁর মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করবেন, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করে তাঁকে জয়ী করবেন এবং তাঁর প্রবর্তিত মতবাদকে চিরস্থায়ী করে দিবেন, তা কখনো হতে পারে না। এ সব কথা কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক চিন্তাও করতে পারে না। কাজেই এটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূল ছিলেন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। মুসলিম পণ্ডিতদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা কাফির, তাদের কোন নেক আমল আল্লার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মিরাজ গমন করেন?
   ক. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে; খ. ৬২০ খ্রিস্টাব্দে;
   গ. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে; ঘ. ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে।
২. কত বছর বয়সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) নবুওয়াত লাভ করেন?
   ক. ২৫ বছর বয়সে; খ. ৪০ বছর বয়সে;
   গ. ৬৩ বছর বয়সে; ঘ. ৫৭ বছর বয়সে।
৩. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়াত অস্বীকারকারী-
   ক. ফাসেক; খ. জাহেল;
   গ. মুনাফিক; ঘ. কাফির।
৪. মহানবীর নবুওয়াতের প্রমাণ হল-
   ক. তিনি আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন; খ. তিনি একজন উম্মি ছিলেন;
   গ. তাঁর কাছে ওহী আসতো; ঘ. তিনি কাবার পাশে ইবাদত করতেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আলোকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অলৌকিক ঘটনার দ্বারা তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ দিন।
৩. মিরাজের ঘটনা দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৪. 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পরিচ্ছন্ন জীবন তাঁর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ' ব্যাখ্যা করুন।

৫. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাস্তব ভিত্তিক সুসমনীতিমালার প্রবর্তন তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ, বুঝিয়ে লিখুন।
৬. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণের ক্ষেত্রে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) নবী ও রাসূল ছিলেন দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৭

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবেন;
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর 'আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়াই যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ' তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী-এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন এবং পরকালেও মর্যাদাবান করেছেন, যা অন্য কোন নবী ও রাসূলগণ লাভ করতে সক্ষম হননি। পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আশিটিরও অধিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত মর্যাদা দান করেছিলেন, যেগুলোতে তিনি একক বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর একার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর আবির্ভাবের পর সেগুলোকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, তিনি নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নিম্নে কুরআনও হাদীসের আলোকে তা প্রমাণ করা হল :

এ পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর আবির্ভাবের পর সেগুলোকে আরো সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন।

আল-কুরআনের আলোকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

১. হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে সকল নবী ও রাসূলের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার গ্রহণ:

আল্লাহ তা'আলার এ অঙ্গীকার গ্রহণের ফলে হযরত মুহাম্মদ (স) সকল নবী ও রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীগণের অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতে যা কিছু দিয়েছি অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।" (সূরা আলে-ইমরান : ৮১)।

হযরত আলী ও ইবনে আবাস (রা) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সকল নবী ও রাসূলের কাছ থেকে মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে এ অঙ্গীকার নেন যে, তারা স্বয়ং যদি তাঁর সময়ে জীবিত থাকেন, তবে যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন এবং স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান।"

হযরত মুহাম্মদ (স) যদি সে সব নবী ও রাসূলগণের সময়ে আবির্ভূত হতেন, তবে তিনি সবার নবী

হতেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজের উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও নবী। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, "আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে তিনি আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোন পথ থাকত না।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যখন হযরত ঈসা (অ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও আল-কুরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি বিধান মেনে চলবেন।

২. তাঁর সম্পর্কে সকল নবীর অবহিত হওয়া :

পৃথিবীতে এমন কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি যিনি হযরত মুহাম্মদ (স), তাঁর প্রেরিত হওয়া, আবির্ভাবের সময়, হিজরাত এবং তাঁর নিদর্শনাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

পৃথিবীতে এমন কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি যিনি হযরত মুহাম্মদ (স), তাঁর প্রেরিত হওয়া, আবির্ভাবের সময়, হিজরাত এবং তাঁর নিদর্শনাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন :

"আমি যখন আল্লাহর নিকট সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত, তখন হযরত আদম (আ) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন: আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুআর ফসল, হযরত ঈসা (আ) এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন-যখন তিনি আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন তখন তিনি দেখেছেন যে, তার গর্ভ থেকে আর্ভিভূত হয়েছে এক উজ্জ্বল আলো যার দ্বারা সিরিয়ার রাজপ্রসাাদসমূহ আলোকিত হয়েছে।"

মায়সারাতুল ফজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কখন থেকে নবী ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আদম (আ) যখন আত্মা ও শরীর-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছিলেন।"

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন তা উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা জানি, হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম মানুষ ও নবী। কিন্তু তাঁর জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও তিনি এ পৃথিবীতে সর্বশেষ নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ।

মহানবী (স) একজন নবী এবং রাসূল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম মুসলমান হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, যা অন্যান্য নবী-রাসূল থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং এ স্বতন্ত্রতা নবীদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বই বহন করে।

৩. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুজিযা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সত্যতা প্রমাণ ও মানুষকে সৎপথের সহায়ক শক্তিরূপে তাঁদের প্রত্যেককে কোন না কোন অলৌকিক প্রমাণ বা মুজিযা দান করেছেন। সেগুলো তাঁদের নবুওয়াতের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করেছে। সকল যুগে রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও হিদায়াতের পথ সুগম করে ঈমানী সফলতা আনয়নে মুজিযার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁদের সকলেরই মুজিযা ছিল তৎকালীন সময়ের জন্য। তাঁদের তিরোধানের সাথে সাথে তাঁদের মুজিযারও অবসান ঘটেছিল। যেমন- হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি যা সাপে পরিণত হত, হযরত ঈসা (আ) মাটির টুকরায় ফুঁ দিলে পাখি হয়ে উড়ে যেত ইত্যাদি।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতী জীবনে অসংখ্য মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় মুজিযা হচ্ছে, আল-কুরআন। উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনের মত গ্রন্থ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল হওয়াটাই এত বড় মুজিযা যে, তাঁর রাসূল হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এটাই যথেষ্ট। আল-কুরআনকে তিনি সর্বসমক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিরোধীদেরকে-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রকাশ্যে আহবান করেছিলেন। কিন্তু কেউই আল-কুরআন এর মতো একটি গ্রন্থ রচনা তো দূরের কথা, আল-কুরআনের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র সূরাও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। আল-কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুজিযার সঙ্গে মোকবিলা করার জন্য অমুসলিমদের আহবান করে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩)

এই আয়াতটি আল-কুরআনের অন্যতম চিরন্তন মুজিযা এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি চিরন্তন চ্যালেঞ্জ। আল-কুরআন সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। আল-কুরআন মহানবী (স)-এর শ্রেষ্ঠ মুজিযা যা চিরস্থায়ী। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুজিযার চিরস্থায়িত্ব তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দলীল বহন করে।

৪. হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন খাতামুল আম্বিয়া

এটা নবীগণের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনিই নবুওয়াতের ধারা খতমকারী। হযরত আদম (আ) যখন আত্মা ও শরীর এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি নবী ছিলেন। তিনি মানব সমাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বনি আদম। প্রত্যেক নবীর জীবন ব্যবস্থা বা শরীআত ছিল স্বল্প সময়ের জন্য। একজন নবীর তিরোধন হয়ে গেলে আরেকজন নবী নতুন বিধান নিয়ে আবির্ভূত হতেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। আর অন্যান্য নবীগণ কোন গোত্র বা দেশের জন্য আবির্ভূত হতেন এবং তাদের তিরোধানের সাথে সাথে সেই শরীআত রহিত হয়ে যেত। কিন্তু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) সকল যুগের সকল জাতির মানুষের হিদায়েতের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সর্বকালের সকল যুগের মানুষের হিদায়াতের জন্য উপযোগী হওয়াটা অন্যান্য নবীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

৫. নবীদের প্রতি আল্লাহর সম্বোধন

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে আম্বিয়ায়ে কিরামগণের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন কিন্তু কোথাও হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

"আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছিলোম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছে। আর ওহী পাঠিয়েছি ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৩)

আল-কুরআনের যে সকল স্থানে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। বরং সেখানে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" (সূরা আল-আহযাব : ৪০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি

সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবে।" (সূরা আল-ফাতহ : ২৯)

আল্লাহ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যখনই সম্বোধন করেছেন, তখন তাকে হে নবী বা হে রাসূল বলে সম্বোধন করেছেন। কখনো নাম ধরে সম্বোধন করে বলেননি যে, (হে মুহাম্মদ)। এমনকি রাসূলের সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু না করার এবং একে অপরের সাথে যে রকমভাবে উঁচু স্বরে কথা বলে এবং নাম ধরে ডাকে সেরূপ তাঁর বেলায় করতে উম্মতদেরকে নিষেধ করেছেন, যা অন্যান্য নবীদের বেলায় নিষিদ্ধ ছিল না। এতে রাসূল (স)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

৬. কিয়ামত দিবসে নবীদের নেতা নির্বাচিত হওয়া তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

যখন কিয়ামত দিবস অনুষ্ঠিত হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সকল নবীর নেতা বা ইমাম নির্বাচিত হবেন এবং তাঁদের খতীব হবেন। তাঁদের সুসংবাদদাতা হবেন। তাঁদের শাফায়াতকারী হবেন। আর এটা হবে তাঁর জন্য সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা।

যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সকল নবীর নেতা বা ইমাম নির্বাচিত হবেন এবং তাঁদের খতীব হবেন। তাদের সুসংবাদদাতা হবেন। তাঁদের শাফায়াতকারী হবেন।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূল (স) বলেন-

أنا أول الناس خروجا اذا بعثوا . وأنا خطيبهم اذا وفدوا. وأنا مبشر هم اذا ائسوا، . لواء الحمد يومئذ بيدى ، وانا اكرم ولد ادم عند ربى ولا فخر .

"কিয়ামত দিবসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আমাকে উঠানো হবে, যখন তারা একত্রিত হবে তখন আমি তাদের খতীব হব, যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে তখন আমি তাদের সুসংবাদদাতা হব, প্রশংসার পতাকা সেদিন আমার হাতে থাকবে। আমি আদম সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর কাছে বেশী সম্মানিত হব, এতে গর্বের কিছু নেই।"

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন : "কিয়ামত দিবসে আমি নবীগণের নেতা হব এবং তাদের খতীব হব এবং তাঁদের শাফায়াতকারী হব। এতে আমার গর্ব নেই।" (ইমাম আহমদ, তিরমিযী, হাকেম)।

৭. অন্যান্য নবীর তাঁর পতাকাতলে সমবেত হওয়া

কিয়ামত দিবসে সকল নবীর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পতাকাতলে সমবেত হওয়া তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। কিয়ামত দিবসে লোকজন তথা নবীগণ তাঁর পতাকতলে সমবেত হবেন। আর এটা হবে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা। হযরত ওবাদা ইবন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন : "আমি কিয়ামত দিবসে মানবজাতির নেতা হব, এতে আমার কোন গর্ব নেই। কিয়ামত দিবসে সবাই আমার পতাকা তলে অবস্থান করবে।"

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فضلت عل الانبياء بست، لم يعطهن أحد كان قبلى : غفرلى ماتقدم من ذنبى وما تأخر. وأحلت لى الغنا ئم ولم تحل لأحد كان قبلى ، وجعلت أمتى خير الأمم ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الكوثر. ونصرت با لرعب.

"আমাকে সকল নবীর উপর ছয়টি বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমার পূর্বে অন্য কাউকে তা দেওয়া হয়নি। আমার অগ্র এবং পশ্চাতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। মালে গণীমত (যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, আমার পূর্বে কারো জন্য তা বৈধ ছিল না। আমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করা হয়েছে। জমীনকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। আমাকে হাউজে কাওছার দান করা হয়েছে। শত্রুর অন্তরে ভয়-ভীতির দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, পৃ. ৪৬৯)

৮. জান্নাতের দরজায় সর্বপ্রথম আঘাত করা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

পারলৌকিক জীবনে তিনি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় আঘাত দিবেন এবং তার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্বে অন্য কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন:

أنا أكثر الانبياء تبعا يوم القيا مة وأنا أول من يقرع باب الجنة.

"কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারী সংখ্যা অন্যান্য নবীর অনুসারীদের তুলনায় বেশি হবে। আর আমি হব জান্নাতের দরজায় আঘাতকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি।" (মুসলিম)

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে পুলসিরাত পার হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। মহানবী (স)-এর এ সকল বিরল সম্মান ও মর্যাদা যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এ সবগুলোই সকল নবীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলগণের যে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শানেই তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. হযরত মুহাম্মদ (স) কেন শ্রেষ্ঠ নবী?
   ক. তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন;
   খ. তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী মহিলার স্বামী ছিলেন;
   গ. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া আখিরাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন;
   ঘ. তিনি সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন।

২. উম্মী কাকে বলে?
   ক. যিনি উম্মত গঠন করেন; খ. যিনি লেখাপড়া জানেন না;
   গ. যিনি সামান্য লেখাপড়া জানেন; ঘ. যিনি তাওরাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

৩. প্রথম নবী কে ছিলেন?
   ক. হযরত আদম (আ); খ. হযরত সুলাইমান (আ);
   গ. হযরত ঈসা (আ); ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স)।

৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে অন্য নবীগণের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে-
   ক. ৩টি বিষয়ে; খ. ৯টি বিষয়ে;
   গ. ৬টি বিষয়ে; ঘ. ৫টি বিষয়ে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে "সকল নবী ও রাসূলের নিকট থেকে আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ" ব্যাখ্যা করুন।
২. "মহানবী (স)-এর চিরন্তন অলৌকিকতা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ" কথাটি বুঝিয়ে লিখুন।
৩. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কিয়ামত দিবসে সকল নবীর নেতা নির্বাচিত হবেন, হাদীসের আলোকে প্রমাণ করুন।
৪. ক'টি বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে অন্যান্য নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে? সেগুলো আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল ছিলেন-আলোচনা করুন।

পাঠ-৮

হযরত মুহাম্মদ (স) খাতামুল আম্বিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- খাতামুন নবুওয়াত-এর আভিধানিক অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইজমা দ্বারা খাতামুন নবুওয়াতের প্রমাণ দিতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন খাতামুল আম্বিয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে সকল নবী ও রাসূলের রিসালাতের উপর খাতাম বা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি খাতাম লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী সকল শরীআতের উপর। অতঃপর তাঁর শরীআত ছাড়া আর কোন শরীআত গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর আর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছিলেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল, তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওয়াতের মোহর অংকিত করে দেওয়া। তারপর থেকে তিনি নবুওয়াত সমাপ্তকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন খাতামুন নবুওয়াত বহনকারী। রাসূল (স)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তিনি খাতামুন নবুওয়াত দ্বারা মোহরাংকিত ছিলেন। আর সে ঘটনা ঘটেছিল বনী সাদ গোত্রে যখন তিনি দুগ্ধ পান করতেন।

খাতামুন নবুওয়াত আর শব্দ। এর অর্থ নবুওয়া পরিসমাপ্তি। হযরত মু (স)-এর পর মানবজা হিদায়াতের জন্য আর নবী বা রাসূল আসবেন

খাতামুন নবুওয়াত-এর অর্থ

খাতামুন নবুওয়াত আরবি শব্দ। এর অর্থ নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। খাতাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া এবং কোন কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা। যেমন:

ختم العمل اى فرغ من العمل

এর অর্থ হলো: কাজ শেষ করে ফেলা অর্থাৎ কাজ থেকে অব্যাহতি লাভ করা। বলা হয়, ختم الاناء পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে কোন কিছু ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। তদ্রূপ ختم الكتاب এর অর্থ হলো পত্র বন্ধ করে তার উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া। ফলে পাত্রটি সংরক্ষিত হল। আরো বলা যায় ختم على القلب অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর বাইরের কোন কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং তার ভেতরের কোন স্থিতিশীল কথা বাইরে বেরুতে পারবে না। আরো বলা হয়, خاتمة كل شئ أى عاقبته واخرته অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থাৎ তার পরিণাম এবং পরিসমাপ্তি। আরো প্রচলিত আছে। ختم الشئ اى بلغ اخره অর্থাৎ কোন জিনিসকে খতম করার অর্থ হল তা শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। খতমে কুরআন এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আর এ অর্থের উপর ভিত্তি করেই প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় খাওয়াতিম। 'লিসানুল আরব' নামক অভিধানে আছে, خاتم القوم أى اخرهم অর্থাৎ 'জাতির শেষ ব্যক্তিটি'। যেমন বলা হয়, جاء خاتم القوم অর্থাৎ 'গোত্রের সবাই এসে গেছে এমন কি শেষ ব্যক্তিও এসেছেন।' এখানে একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, গোত্রের

শ্রেষ্ঠ ও কামিল ব্যক্তি এসেছেন।

সে জন্যই সমগ্র অভিধান বিশারদ এবং তাফসীরকারগণ একযোগে 'খাতামুন নাবিয়ীন' শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন 'আখিরু নাবিয়ীন' অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবি অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী খাতাম এর অর্থ ডাক ঘরের মোহর নয়, যা চিঠির উপর লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট করা হয়। বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

আল-কুরআনের আলোকে খাতামুন নুবওয়াত প্রমাণ

রত মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহ তা'আলা এমন কটি ধর্ম বা জীবনাদর্শ া প্রেরণ করেছেন যে, নতুন কিছু সংযোজন বিয়োজন করার ব্যবস্থা ইসলাম এমন একটি জীবনাদর্শ যা সর্বাবস্থায় সর্বযুগের উপযোগী।

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার উদ্দেশ্য যে সকল নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি ধর্ম বা জীবনাদর্শ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তাতে নতুন কিছু সংযোজন এবং বিয়োজন করার ব্যবস্থা নেই এবং প্রয়োজনও নেই। ইসলাম এমন একটি জীবনাদর্শ যা সর্বাবস্থায় সর্বযুগের উপযোগী। এটা একটি পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর ও উন্নততর জীবন ব্যবস্থা এবং উত্তম আদর্শ। এর পর আর কোন আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। কিয়ামত পর্যন্ত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থাই চালু থাকবে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-জুমুআহ : ৩)

অত্র আয়াতে রাসূল (স)-এর বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নবুওয়াত এবং রিসালাতের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এ নবুওয়াত এবং রিসালাত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর জন্য এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তা বর্তমান থাকবে। সুতরাং অপর কোন নবী বা রাসূলের আগমনের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না এবং কোন অবকাশও নেই।

হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশেষ নবী ছিলেন একথা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব : ৪০)

বিদায় হজ্জে আরাফাত ময়দানে অবতীর্ণ আল-কুরআনের আয়াতটি ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করালাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজিও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং আর কোন নতুন দীনের আবির্ভাব বা নতুন কোন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন।

এ আয়াতের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী এবং তাঁর কিতাবই সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর পর আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না এবং কোন আসমানী কিতাবও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবে না।

হাদীসের মাধ্যমে খাতামুন নবুওয়াতের প্রমাণ

পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খতমে নবুওয়াত প্রমাণিত। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কতিপয় হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হল। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন-

أن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمنلى رجل بنى بيتا فأ حسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواباه. فجعل الناس يطو فونه ويعجبون له ويقو لون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنة . وأنا خاتم النبيين .

"আমি ও আমার পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। প্রাসাদটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলবে, এ স্থানে একটি ইট রাখা হয়নি কেন? তিনি বললেন : আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী। অর্থাৎ আমার আগমনের পর নবুওয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্য স্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোন নবীর প্রয়োজন হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

মুসনাদ ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنا ئم وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا و أرسلت الى الخلق كافة وختم بى النبييون .

"রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে:

১. আমাকে পূর্ণ অর্থ ব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২. শত্রুর অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টির দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. গণীমতের অর্থ সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। ৪. পৃথিবীর জমীনকে আমার জন্য মসজিদে পরিণত করা হয়েছে এবং মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ৫. সমগ্র দুনিয়ার জন্য আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার উপর নবীদের আগমন শেষ করে দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন,

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى

"রিসালাত এবং নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোন রাসূল এবং নবী আসবেন না।" (তিরমিযী)

মুসনাদ দারেমীতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন:

أنا قائد المر سلين ولا ضخروأنا خاتم النبيين ولا فخر

"আমি রাসূলগণের নেতা, এতে আমার গর্বের কিছু নেই, আমি সর্বশেষ নবী, এতেও আমার গর্বের কিছু নেই।" (দারিমী)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূল (স) বলেন:

أنا محمد أنا أحمد وأنا المحى ألذى يمحى بى الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى وأنا العاقب الذى ليس بعده نبى .

"আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদের হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। আমি সবার শেষে আগমনকারী, যার পরে আর কোন নবী আসবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিরিমিযী শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূল (স) বলেন:

لو كان بعدى نبى لكان عمربن الخطاب

"আমার পরে যদি কোন নবী হতো, তা হলে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী হতো।" (তিরমিযী)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى أنت منى بمنز لة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى

"রাসূল (স) আলী (রা)-কে বলেন, "আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক মূসার সঙ্গে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোন ব্যক্তি নবী হবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট থেকে সাহাবা কিরাম হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সনদসহ উল্লেখ করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর কোন নবী আসবেন না। নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা তাঁর উপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে যে ব্যক্তি নবী দাবি করবে সে হবে দাজ্জাল এবং কাজ্জাব। আল-কুরআনে খাতামুন নাবিয়ীন শব্দের চাইতে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (স) বাণীই এখানে প্রকৃত সনদ এবং প্রমাণ।

সাহাবা কিরামের ইজমা দ্বারা খাতামুন নবুওয়াত-এর প্রমাণ

পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ইসলামী শরীআতের তৃতীয় মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। হযরত মুহাম্মদ (স) যে শেষ নবী ও রাসূল এবং তার উপর যে নবুওয়াত খতম হয়েছে তা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যে সকল মিথ্যবাদী লোক নবুওয়াতের দাবি করে এবং যারা তাদের নবুওয়াত স্বীকার করে নেয় তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মূসাইলামা বিন কাযযাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রাসূল (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করেনি বরং সে দাবি করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পূর্বে সে তাঁর নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

"আল্লাহর রাসূল মূসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর নিকট প্রেরণ করা হল। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুওয়াতের কাজে শরীক করা হয়েছে।"

এভাবে রিসালাতে মুহাম্মদীকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়ার পরও তাকে ইসলাম বহির্ভুত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের ইজমার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে নবুওয়াত পরিসমাপ্তি হয়েছে বলে প্রমাণিত।

তাছাড়া হিজরী প্রথম শতক থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকায় আলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল নেই।

নবী ও রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুগোপযোগী একটি পরিপূর্ণ ও সুন্দরতম জীবনাদর্শ মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করা। মহানবী (স)-এর আনীত আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত যেমন সকল যুগের উপযোগী, তেমনি একটি পরিপূর্ণ ও সুন্দরতম

জীবনাদর্শ। তাই বিকল্প কোন জীবনাদর্শেরও প্রয়োজন নেই এবং নবীরও প্রয়োজন নেই।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. 'খাতামুল ইনা' শব্দের অর্থ হচ্ছে-
   ক. পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া;
   খ. পাত্রের মুখে সীলমোহর লাগিয়ে দেওয়া;
   গ. পাত্রকে উপুর করে রাখা;
   ঘ. পাত্রের মুখে কোন জিনিস দিয়ে চাপা দেওয়া।

২. খাতামুন নবুওয়াত শব্দের অর্থ হলো-
   ক. হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী;
   খ. হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী;
   গ. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি;
   ঘ. নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি।

৩. 'লিসানুল আরাব' একটি-
   ক. তাফসীরের কিতাব;
   খ. হাদীসের কিতাব;
   গ. অভিধান গ্রন্থ;
   ঘ. ইসলামের আইনের কিতাব।

৪. রিসালাত ও নবুওয়াত দু'টি-
   ক. একই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ;
   খ. ভিন্নার্থক শব্দ;
   গ. বিপরীত অর্থবোধক শব্দ;
   ঘ. প্রায় সমার্থবোধক শব্দ।

৫. পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ কোনটি?
   ক. কাবা শরীফ;
   খ. মসজিদে নববী;
   গ. মসজিদুল আকসা;
   ঘ. মসজিদে কুবা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. 'হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন খাতাম্মল আম্বিয়া' কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
২. খাতামুন নবুওয়াত শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. আল-কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৪. হাদীসের আলোকে খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৫. ইজমা বলতে কী বুঝেন? ইজমা দ্বারা কী খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করা যায়? বুঝিয়ে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খাতামুন নবুওয়াত বলতে কী বুঝেন? 'হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী ও রাসূল ছিলেন' আলোচনা করুন।

নোট করুন